বাংলা সহায়ক পাঠ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

বাংলা সহায়ক পাঠ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারী, ১৯৮৮
পুনর্মুদ্রণ
জুন, ১৯৯০
মার্চ ১৯৯১
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
মে, ১৯৯৩
জুন ১৯৯৪
জুলাই ১৯৯৪

প্রকাশক
শ্রীসুদিন চট্টোপাধ্যায়
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রাকর : মুদ্রণ
৭৭/২/১ লেনিন সরণী
কলিকাতা—১৩

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন পাঠক্রম অনুসারে সংকলিত বাংলা সহায়ক পাঠ গ্রন্থটি এবারে পর্ষদ নিজেই প্রকাশ করলো। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বহু প্রতিভাবান কবি ও সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের রচনার রস-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের অন্ততঃ প্রাথমিক পরিচয় হোক—এটা অবশ্যই কাম্য। বিশেষতঃ মাধ্যমিক স্তরটি বহু ছাত্রের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য পাঠের শেষ স্তর হয়ে উঠবে। এদের অনেকেই নানা কারণে উচ্চতর শিক্ষায় সাহিত্যের দিকে হয়ত আর অগ্রসর হতে পারবে না। তাই মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র পরিধির কিছু পরিচয় করিয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের মূল পাঠ্য গ্রন্থের বাইরে সহায়ক পাঠ গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যেন নতুনতর বোঝা হয়ে না ওঠে—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গল্প ও কবিতার সংখ্যা সীমিত রাখা হল। এরই মধ্যে রস-বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই সংকলনটি যাতে প্রতিনিধি-স্থানীয় হয়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ মন নিয়ে আনন্দের সঙ্গে এই গল্প ও কবিতাগুলি পাঠ করবে এবং সেই সূত্রে সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়ে রসের জগতের গভীরে বিচরণ করার তাগিদ অনুভব করবে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্প ও কবিতাগুলির রসমাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সঞ্চার করে দিতে পারলেই এই সংকলনটির প্রকাশ সার্থক হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হল।

৯ই অক্টোবর, ১৯৮৭

রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সভাপতি

বিষয়-সূচী

গল্প

		পৃষ্ঠা
কুম্ভীর বিভ্রাট	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১
রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
পোস্টমাস্টার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯
বলাই	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫
কাবুলিওয়ালা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
ফুলের মূল্য	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৮
অভাগীর স্বর্গ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৮
মামলার ফল	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৮
তাসের ঘর	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২
উৎকোচতত্ত্ব	রাজশেখর বসু	৭২
বামা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯
বেড়া	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫
বুড়িটা	বনফুল	৯১
কুইন অ্যান	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৯৪
লোহার বিস্কুট	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫
একপো দুধ	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১১৭
ঐশ্বরিক	সুবোধ ঘোষ	১২৫
সাদা ঘোড়া	রমেশচন্দ্র সেন	৩৩১
অনাচার	আশাপূর্ণা দেবী	১৩৮
দেবতার জন্ম	শিবরাম চক্রবর্তী	১৪৬
ক্লাস ফ্রেন্ড.	সত্যজিৎ রায়	১৫৪

কবিতা

দুরন্ত আশা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৫
মৃত্যুঞ্জয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৮
জুতা আবিষ্কার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৯
সাঁওতাল মেয়ে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭৩
কাজলা দিদি	যতীন্দ্রমোহন বাগচী	১৭৫
সাবধান, সাবধান !	মুকুন্দ দাস	১৭৬
দো-রোখা একাদশী	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৭৭
চম্পা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৭৮
কৃষ্ণা রজনী	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৭৯
হাট	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৮১
নোটবুক	সুকুমার রায়	১৮২
কালবৈশাখী	মোহিতলাল মজুমদার	১৮৩
চাঁদসদাগর	কালিদাস রায়	১৮৫
বিংশ শতাব্দী	কাজী নজরুল ইসলাম	১৮৭
সাহেব ও মোসাহেব	কাজী নজরুল ইসলাম	১৮৯
আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ	১৯১
গাছ	অমিয় চক্রবর্তী	১৯২
নিমন্ত্রণ	জসীমউদ্দীন	১৯৩
ফ্যান	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৯৪
জয়যাত্রা	আব্দুল কাদির	১৯৫
পাণ্ডুলিপি	বুদ্ধদেব বসু	১৯৬
জনমদুখিনীর ঘর	অরুণ মিত্র	১৯৭
ভাষা	বিষ্ণু দে	১৯৯
খুকুর শাস্তি	বিমলচন্দ্র ঘোষ	২০০
ইতিহাস	অশোকবিজয় রাহা	২০২
কাস্তে	দিনেশ দাস	২০২
চিঠি	মনীন্দ্র রায়	২০৩
স্বাগত	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	২০৭
জননী যন্ত্রণা	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	২০৮
জন্মভূমি আজ	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০৯
উলঙ্গ রাজা	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	২১০
রবীন্দ্রনাথের প্রতি	সুকান্ত ভট্টাচার্য	২১২
বাঙলা ভাষা উচ্চারিত হলে	শামসুর রাহমান	২১৩
প্রবচন		২১৫

গল্প

কুম্ভীর-বিভ্রাট

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুনিয়াছি যে সুন্দরবনে নদীনালায় অনেক কুমীর আছে। তোমার আবাদে কুমীর কিরূপ ?"

ডমরুধর বলিলেন,—"কুমীর! আমার আবাদের কাছে যে নদী আছে, কুমীরে তাহা পরিপূর্ণ। খেজুর গাছের মত নদীতে তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়, অথবা কিনারায় উঠিয়া পালে পালে তাহারা রৌদ্র পোহায়। গরুটা, মানুষটা, ভেড়াটা, ছাগলটা, বাগে পাইলেই লইয়া যায়। কিন্তু এ সব কুমীরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। এবার আমার আবাদের নিকট এক বিষম কুমীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। গন্ধমাদন পর্ব্বতে কালনিমের পুকুরে যে কুম্ভীর হনুমানকে ধরিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক, গঙ্গাদেবী যে মকরের পীঠে বসিয়া বায়ু সেবন করেন, সে মকরকে এ কুমীর একগালে খাইতে পারে। পর্ব্বতপ্রমাণ যে গজ সেকালে বহুকাল ধরিয়া কচ্ছপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সে গজ-কচ্ছপকে এ কুমীর নস্য করিতে পারে। ইহার দেহ বৃহৎ, তালগাছের ন্যায় বড়, ইহার উদর এই দালানটির মত, অন্যান্য কুমীর জীবজন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এ কুমীরটা আস্ত গরু, আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়া মানুষ ও গরু-বাছুর লইয়া যাইত। লাঙ্গুলে জল আনিয়া দেওয়াল ভিজাইয়া গর্ত্ত করিত। ইহার জ্বালায় নিকটস্থ আবাদের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রজাগণ পাছে আবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করে, আমাদের সেই ভয় হইল, তাহার পর লাঙ্গুলের আঘাতে নৌকা ডুবাইয়া আরোহীদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে নিমিত্ত এ পথ দিয়া নৌকায় যাতায়াত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভয়ানক কুম্ভীরের হাত হইতে কিরূপে নিস্কৃতি পাই এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আমার আবাদের নিকট একখানি নৌকা ডুবাইয়া তাহার আরোহীদিগকে একে একে আমাদের সমক্ষে সে গিলিয়া ফেলিল। এই নৌকায় এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্ব্বদেশে যাইতেছিলেন। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জান যে, কুমীরের পেটে মাংস হজম হয়, গহনা পরিপাক পায় না। কুমীর যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইল,

—চিরকাল আমি কপালে পুরুষ, যদি এই কুমীরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া এই গহনাগুলি বাহির করিব, অন্ততঃ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। বড় একটি জাহাজের নঙ্গর কিনিয়া উকো ঘষিয়া তাহাতে ধার করিলাম, তাহার পর যে কাছিতে মানোয়ারি জাহাজ বাঁধা থাকে, সেইরূপ এক কাছি ক্রয় করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম। আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমীর আর একটা মানুষ খাইয়াছে। চারিদিন পূর্ব্বে এক সাঁওতালনী একঝুড়ি বেগুন মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল। সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে আর কুমীর তাহাকে ধরিয়া বেগুনের ঝুড়ির সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সাঁওতাল প্রজাগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; বলিতেছে যে, আবাদ ছাড়িয়া তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে।

আবাদে আসিয়া নঙ্গরটিকে আমি বঁড়শী করিলাম। তাহাতে জাহাজের কাছি বাঁধিয়া দিলাম, মাছ ধরিবার জন্য লোকে যে হাতসূতা ব্যবহার করে, বৃহৎ পরিমাণে এও সেইরূপ হাতসূতার ন্যায় হইল। নঙ্গরের তীক্ষ্ন অগ্রভাগে এক মহিষের বাছুর গাঁথিয়া নদীর জলের নিকট বাঁধিয়া দিলাম। কাছির অন্যদিক একগাছে পাক দিয়া রাখিলাম, তাহার পর পঞ্চাশ জন সবল লোককে নিকটে লুক্কায়িত রাখিলাম। বেলা তিনটার সময় আমাদের এই সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইল।

বঁড়শীতে মহিষের বাছুর বিঁধিয়া দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণ আমরা একেবারে বধ করি নাই। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সে গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল, তাহার ডাক শুনিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে সেই প্রকাণ্ড কুমীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার লেজের ঝাপটে পর্ব্বতপ্রমাণ এক ঢেউ উঠিল, সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবিয়া গেল তখন আর আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই কাছিতে টান পড়িল। তখন আমরা বুঝিলাম যে, নঙ্গরবিদ্ধ বাছুরকে কুমীর গিলিয়াছে, বঁড়শীর ন্যায় নঙ্গর কুমীরের মুখে বিঁধিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভাগ্যে গাছে পাক দিয়া রাখিয়াছিলাম, তা না হইলে কুমীরের বলে এই পঞ্চাশ জন লোককে নদীতে গিয়া পড়িতে হইত। আমরা সেই রাক্ষস কুমীরকে বঁড়শীতে গাঁথিয়াছি, ঐ কথা শুনিয়া চারিদিকের আবাদ হইতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল। প্রায় পাঁচশত লোক সেই রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দারুণ আসুরিক বলে কুমীর সেই পাঁচশত লোকের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কখন আমাদের ভয় হইল যে, তাহার বিপুল বলে নঙ্গর বা ভাঙ্গিয়া যায়, কখন ভয় হইল যে, সে জাহাজের দড়া বা ছিঁড়িয়া যায়। কখন ভয় হইল,

গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে গিয়া বা পড়ে। নিশ্চয় একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিত, যদি না সাঁওতালগণ কুমীরের মস্তকে ক্রমাগত তীরবর্ষণ করিত, যদি না নিকটস্থ দুইটি আবাদের লোক বন্দুক আনিয়া কুমীরের মাথায় গুলী মারিত। তীর ও গুলী খাইয়া কুমীর মাঝে মাঝে জলমগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিশ্বাস লইবার জন্য পুনরায় তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে হইল। সেই সময় লোক তীর ও গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। কুমীরের রক্তে নদীর জল বহুদূর পর্য্যন্ত লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কুমীরের সহিত আমাদের এইরূপ যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃকালে কুম্ভীর হীনবল হইয়া পড়িল। বেলা নয়টার সময় তাহার মৃতদেহ জলে ডুবিয়া গেল। তখন অতি কষ্টে তাহাকে আমরা টানিয়া উপরে তুলিলাম।

বড় বড় ছোরা বড় বড় কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে রাক্ষস কুমীরের পেট অতি কঠিন ছিল। আমাদের সমুদয় অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে করাত আনাইয়া করাতের দ্বারা তাহার উদর কাটাইলাম। কিন্তু পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেখিলে ?"

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে ?"

অন্যান্য শ্রোতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে ?"

ডমরুধর বলিলেন,—"বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে সেই সাঁওতাল রমণী চারদিন পূর্ব্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই রমণী পূর্ব্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্ব্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া রমণী বেগুন বেচিতেছে।"

শঙ্কর ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছিল ?,'

ডমরুধর বলিলেন,—"হাঁ ভাই কুমীরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর বসিয়া স্ত্রীলোকটি বেগুন বেচিতেছিল।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল ? কুমীরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা ?"

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন—"তোমার এক কথা ! কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না। সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম,—"ওহে ! ও গহনা আমার। অনেক টাকা খরচ করিয়া আমি কুমীর ধরিয়াছি, ও গহনা খুলিয়া দে।" কেঁউ মেউ করিয়া স্ত্রীলোকটি আমার সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার

পর তাহার পুত্রগণ ও তাহার জাতি-ভাইগণ কাঁড়বাঁশ ও লাঠিসোটা লইয়া আমাকে মারিতে দৌড়িল। আমার প্রজাগণ কেহই আমার পক্ষ হইল না। সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সাঁওতালগণ সে স্ত্রীলোকটিকে ঘরে লইয়া গেল। পূর্ব্বদেশীয় সে ভদ্রমহিলার একখানি গহনাও আমি পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, কপালে পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।"

লম্বোদর বলিলেন,—"এত আজগুবি গল্প তুমি কোথায় পাও বল দেখি?"

ডমরুধর বলিলেন,—"এতক্ষণ হাঁ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে গল্পটি শুনিতেছিলে। যেই হইয়া গেল, তাই এখন বলিতেছ যে আজগুবি গল্প। কলির ধর্ম্ম বটে।"

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কুমীরের গল্প যে সত্য, তাহার কোন প্রমাণ আছে?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"প্রমাণ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যথার জন্য এই দেখ সেই কুমীরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কুমীর যদি তালগাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাহার দাঁত এত ছোট কেন? ঠিক অন্য কুমীরের দাঁতের মত কেন?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"অনেক মানুষ খাইয়া সে কুমীরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।"

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাঁহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়ি মাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্তূপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব, তারো সময় পাওয়া যায় না।"

এদিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন—কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই—এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হইয়াছে দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল 'মায়াকান্না'। কিন্তু সেটা বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল—বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন—এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে—কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমতো আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল, তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাগ্নি কে করে—এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।" গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে তাহাকে ক্রিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, "রাম, আমি যদি ক্রিশ্চান হই তো গোমাংস খাই।" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু

স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য-আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালাইয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না—বলিত, "কী গা বাবু কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে ?" সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশী ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই

কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইরূপ কথা-প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল, পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ'

'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু অন্য-দিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমাচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্চে কি?"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—মনে স্থির করিলেন, আর নয় এখান হইতে কোনমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিত

হৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু আমাকে ডাকছিলে ?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্তরাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে'!

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে-কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ-প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া

কহিল, “না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।”

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, “রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।”

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না”—বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া

ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে!

বলাই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তারপর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে—কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই—তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়েচড়ে বেড়ানো নয়। পূর্বদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে ; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায় ; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে ; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে ; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ওই ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ

মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ওই ঘাসের পুঞ্জ একটি গড়িয়ে চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগাত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে—এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, এক যে ছিল রাজাদের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস করে বকুল গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব-চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে— এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হলদে নামহারা

ফুল, অতি ছোটো ছোটো ; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা ; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা কোথাও-বা অনন্তমূল ; পাখিতে খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়ানি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ওই ঘাসিয়াড়াকে বলো না, আমার ওই গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে ; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে ; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অংকুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে

একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ। আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সবচেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়—তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন ; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে—এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দু দিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে ; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না ?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা ; মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্ গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটাদুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া

যাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ওই ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এ দিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু তোমার লড়কী কোথায় গেল।”

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, “উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।” বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ, তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ—সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে!"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী-পর্বত-অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয় এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এ দিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকাল-বেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের 'পরে, কেহ-বা পদব্রজে, কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্দুক —কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাসব্যবসায় প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একে-বারেই কি অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবি-শ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু, তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না সে দিন দেখি, সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু, যখন দেখি মিনি 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফ্‌শীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দুই-তিনদিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায় গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতুহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কী করিব—হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্ত-মতো নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমনকি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। এমনকি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুং ঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সীমা নেই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই,

তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কি রে রহমত, কবে আসিলি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমনকি পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে এক-বাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্‌ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুন্ন হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এনন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।—বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া

বুকের কাছে কোথা হইতে এক-টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। তখন সে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালী সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলিপরা কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমী সসুরবাড়ি যাবিস ?"

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়লার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নতুন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কি হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া

ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ফুলের মূল্য

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

লন্ডন নগরের স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে।

আমি একদিন ন্যাশানাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে সেণ্ট-ম্যাটিন্স লেনে একটি ভোজনশালা আছে, মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লন্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্য বহুলোক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া দৈনিক সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্তে আমার নিকট হইতে অল্পদূরে আর একখানি টেবিলের প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, সেখানে একটি ইংরেজ বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া লইল। অবাক্ হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোশাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক, চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষন্নতাযুক্ত।

সে জানিতে না পারে, এমনভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে

চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহার মূল্য প্রদান করিয়া কর্মচারিণীকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্লিস মিস, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভারতবর্ষীয় ?

—আমার তাহাই অনুমান হয়।

—উনি কি সর্বদাই এখানে আসেন ?

—বোধ হয় না, আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।

—ধন্যবাদ। বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন ? ব্যাপার কি ? আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে আমি ওয়েট্রেসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান ?

—না মহাশয়, আমি ত বিশেষ জানি না। তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।

—শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না ?

—না, আর ত কখনও দেখি না।

॥ দুই ॥

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া তাহার সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম, গুড আফটারনুন।

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া আমি ক্রমে জমাইয়া লইতে লাগিলাম। বালিকা এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ভারতবর্ষীয় ?

—হ্যাঁ।

—আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি কি নিরামিষভোজী ?

উত্তর না দিয়া বলিলাম, কেন বল দেখি ?

—আমি শুনিয়াছি, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।

—তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে ?

—আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।

আমি তখন উত্তর করিলাম, আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি, তবে মাঝে মাঝে নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।

শুনিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাম্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও।

—না অনেক দিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেই জন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, আমার ভ্রাতার কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ, মহাশয় ?

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত ?

বালিকা একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল বলিল, মা বলেন, যদি কোন ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি। বলিয়া অনুনয়পূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়িতে মার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না, অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই।

এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটিরের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব, এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

বালিকাকে বলিলাম, চল না,—আমাকে তোমাদের বাড়ি লইয়া যাইবে ? তোমার মার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিবে ?

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল, এখন আসিতে পারিবেন কি ?

—আহ্লাদের সহিত।

—আপনার কোন কার্যের ক্ষতি হইবে না ত ?

—না—না, মোটেই না। আজ অপরাহ্ণে আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল। আহার সমাধা করিয়া আমরা দুইজনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নামটি কি জানিতে পারি ?

—আমার নাম অ্যালিস মার্গারেট ক্লিফর্ড।

—এদিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি ?

বালিকা বলিল, হ্যাঁ, আমি সিভিল সার্ভিস স্টোর্সে কাজ করি। রোজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।

টেমস নদীর উত্তর কূল দিয়া এমব্যাংকমেণ্ট নামক রাস্তা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলাম, তুমি কি সচরাচর এই রাস্তা দিয়াই যাও।

বালিকা বলিল, না, এ রাস্তায় যদিও ভিড় কম তথাপি ময়লা কাপড়-পরা লোকের সংখ্যা অধিক। আমি তাই স্ট্রাণ্ড এবং হোয়াইটহল দিয়াই বাড়ি যাই।

আমি মনে মনে এই অশিক্ষিতা, দরিদ্রা বালিকার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজ জাতির সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিকট আমার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে।

কথোপকথনে আমরা ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের নিকটবর্তী হইলাম। আমি বলিলাম, তোমাকে কি অ্যালিস বলিয়া ডাকিব, না মিস্ ক্লিফর্ড বলিব ?

মৃদু হাসিয়া বালিকা বলিল, আমি ত এখনও যথেষ্ট বড় হই নাই। আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পারেন। লোকে আমাকে ম্যাগি বলিয়া ডাকে।

—তুমি কি বড় হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ?

—হ্যাঁ।

—কেন বল দেখি ?

—বড় হইলে আমি কর্ম করিয়া অধিক উপার্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার মা বৃদ্ধ হইয়াছেন।

—তুমি যে কর্ম কর, তাহা তোমার মনঃপূত ?

—না। আমার কর্ম বড় যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম করিতে চাহি, যাহাতে আমার মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। যেমন সেক্রেটারীর কাজ।

হাউসেস অব পার্লামেণ্টের নিকট পুলিস প্রহরী পদচারণা করিতেছে। তাহা দক্ষিণে রাখিয়া, ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ পার হইয়া আমরা ল্যাম্বেথে গিয়া পড়িলাম। ইহা দরিদ্রের পল্লী। ম্যাগি বলিল, আমি যদি কখনও সেক্রেটারী হইতে পারি, তবে মাকে এপাড়া হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব।

ছোটলোকের ভিড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার প্রথম নামটি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় নামটি তোমার ডাক নাম হইল কেন ?

ম্যাগি বলিল, আমার মার প্রথম নামও অ্যালিস। তাই আমার পিতা আমার দ্বিতীয় নামটিই সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকিতেন।

—তোমার পিতা তোমাকে ম্যাগি বলিতেন, না ম্যাগসি বলিয়া ডাকিতেন?

—যখন আদর করিয়া ডাকিতেন, তখন ম্যাগসি বলিয়াই ডাকিতেন। আপনি কি করিয়া জানিলেন?

রহস্য করিয়া বলিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ভারতবর্ষীয় কি না, আমাদের জাদুবিদ্যা ও ভূত ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় জানা আছে।

বালিকা বলিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বটে! কি শুনিয়াছ?

—শুনিয়াছি, ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে, যাহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাহাদিগকে ইয়োগী (Yogi) বলে। কিন্তু আপনি ত ইয়োগী নহেন?

—কেমন করিয়া জানিলে ম্যাগি, আমি ইয়োগী নহি?

—ইয়োগীগণ মাংস ভক্ষণ করে না।

—তাই বুঝি তুমি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি নিরামিষভোজী কি না?

বালিকা উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা একটি সংকীর্ণ গৃহদ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। পকেট হইতে ল্যাচকী বাহির করিয়া ম্যাগি দরজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, আসুন।

॥ তিন ॥

মিসেস ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ, মহাশয়?

—সুন্দর দেশ।

—বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?

—নিরাপদ বইকি। তবে এদেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু গরম দেশ।

—সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না?

আমি হাসিয়া বলিলাম, ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে আসে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা বিনষ্ট হয়।

—আর জ্বর?

—জ্বর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্বত্র নহে এবং সব সময়েও নহে।

—আমার পুত্র পাঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক পুরুষ, পাঞ্জাব কেমন স্থান, মহাশয় ?

—পাঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জ্বর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, আমি শুনিয়া সুখী হইলাম।

তাহার কেক তৈয়ারি শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন, ম্যাগি, তুই মিস্টার গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাবপত্র অতি সামান্য এবং অল্পমূল্য। মেঝের উপর কার্পেটখানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন, কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফটোগ্রাফ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ যাত্রার পূর্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস অথবা ফ্রাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বই বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সিমলা শৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে, **To Maggie on her birthday from her loving brother Frank.**

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, ম্যাগি, সেই আংটিটা মিস্টার গুপ্তকে দেখা না।

আমি বলিলাম, তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন না কি ? কই ম্যাগি, কি রকম আংটি, দেখি।

ম্যাগি বলিল, সে একটি জাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্রাঙ্ককে দিয়াছিল। বলিয়া আংটি বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন ?

দেখিলাম, আংটিতে একটি স্ফটিক বসানো রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, ফ্রাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযত মনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্তী যে কোন মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্রাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ না পাইয়া,

আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না। আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন।

দেখিলাম, কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটি এবং একটুকরা সাধারণ কাঁচমাত্র, তাহাও এই জননী ভগিনীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্রাঙ্ক সেই বহুদূর, স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব, অত্যাশ্চর্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বিশ্বাসটুকু ভাঙিয়া দিই কি প্রকারে?

মিসেস ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহ দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, আমি ত কিছু দেখিলাম না।

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে ইন্ডি-আন রাজা নামক হস্তীর পৃষ্ঠে অন্যান্য বালকবালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছিল। হাতি চড়িয়া তাহার আর খুশির সীমা নাই।

এখনও পর্যন্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোন সংবাদ আসে নাই। একদিন মিসেস ক্লিফর্ডের অনুরোধক্রমে ইন্ডিয়া অফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম, যে রেজিমেণ্টে ফ্রাঙ্ক আছে, তাহা এখন সীমান্ত সমরে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস ক্লিফর্ড অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানা পোস্টকার্ড পাইলাম! সে লিখিয়াছে, প্রিয় মিস্টার গুপ্ত, আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহকাল কর্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার আসেন, তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব। ম্যাগি।

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্বেই ম্যাগী ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন, তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।

প্রাতরাশের পর আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথে যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরগত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন ?

ম্যাগি বলিল, মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয়ত তিনি আর বাঁচিবেন না।

আমি ম্যাগিকে সান্তনা দিতে লাগিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।

—আমি বলিলাম, কি ম্যাগি ?

—বসিবার ঘরে আসুন, বলিব।

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ম্যাগি ?

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল, আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্তনা দিই ? ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে জীবিত কি মৃত তাহা ভগবানই জানেন। পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল মাতা। সেই মাতা চলিয়া গেলে ইহার দশা কি হইবে! এই যৌবনোন্মুখী বালিকা এই লন্ডনে দাঁড়াইবে কোথা ?

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্ত আবরণ খুলিয়া দিলাম। বলিলাম, ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার দ্বারা যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।

ম্যাগি বলিল, মিঃ গুপ্ত, আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন, জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

—কি ? কি প্রস্তাব ?

—গতকল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিস্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয়ত ফ্রাঙ্কের কোন সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটেন। আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।

—তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস। আমি অবশ্যই পুনর্বার চেষ্টা করিয়া দেখিব।

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল, কিন্তু এবারও যদি নিষ্ফল হয় ?

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম, বুঝিয়া নিস্তব্ধ রহিলাম।

ম্যাগি বলিল, মিস্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি

অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর মাকে কেবলমাত্র বলেন, ফ্রাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে? বড় অন্যায় হইবে?

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি পুণ্যাত্মা নহি। এ জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমার সর্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম, ম্যাগি তুমি চুপ কর, কাঁদিওনা। সে অঙ্গুরীয় দাও, একবার ভাল করিয়া দেখি। যদি কিছু দেখিতে না পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম, যাও, তুমি দেখ, তোমার মা জাগিয়াছেন কি না।

প্রায় পনর মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছি।

—আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি?

—আসুন।

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম, মিসেস ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে।

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি?

আমি অসংকোচে বলিলাম, হ্যাঁ, মিসেস ক্লিফর্ড, আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।

বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে আনন্দ অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, গড ব্লেস ইউ, গড ব্লেস ইউ।

মিসেস ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

॥ পাঁচ ॥

আমার দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবার ইচ্ছা হইল, ল্যাম্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাসখানেক হইল, কাল বর্ডার দেওয়া চিঠিতে

ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, যে সময় আমি মিসেস ক্লিফর্ডকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহার পূর্বেই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস ক্লিফর্ডের নিকট আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া ম্যাগি ও তাহার মাতার নিকট বিদায় বার্তা জানাইলাম।

ক্রমে লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অদ্য দেশ যাত্রা করিব। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি, এমন সময়ে বহির্দ্বারে শব্দ উত্থিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল, মিঃ গুপ্ত, মিস ক্লিফর্ড আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল, আপনি আজ চলিলেন?

—হ্যাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবার দিন।

—দেশে পৌঁছিতে আপনার কয় দিন লাগিবে?

—দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।

—কোন্ স্থানে আপনি থাকিবেন?

—আমি পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি। কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।

—সেখান হইতে সীমান্ত কি অনেক দূর?

—না, অধিক দূর নহে।

—দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্ট মন্‌রোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি আছে—। কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দুইটি ছলছল করিল।

বলিলাম, আমি যখন ওদিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন করিয়া তোমায় পত্র লিখিব।

ম্যাগি বলিল, কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না?

—কি কষ্ট! কি অসুবিধা! আমি যেখানে থাকিব, সেখান হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি নিশ্চয়ই একবার সুবিধামত গিয়া তোমায় পরে সব জানাইব।

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিল—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, বালিকার এই বহু কষ্টার্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই। বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম, এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য,—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া ফল কি?—এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম। বলিলাম, ম্যাগি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধূম-ধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিঁদুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছিয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড়-বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর-একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা

দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর প্রাঙ্গনের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্ব্বাহ্লেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিবির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বার বার বলিতে লাগিল, ভাগ্যমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো—আমাকেও আশীর্ব্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন। সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-প্রজ্জ্বলিত চিতার অজস্র ধূঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে—মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিন্দুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। উদ্ধর্দৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবিনে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবা—বামুন মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে।

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্! ও ত ধূঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা

দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি ? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নি মরেচে তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা ?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমনকি ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে !—চোখে ধোঁয়া লেগেচে বই ত নয় !

হাঃ, ধোঁ লেগেচে বই ত না ! তুই কাঁদতেছিলি !

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সংকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

২

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলাকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট কিন্তু সেই ছোট কাঙাল-জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ওই শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনেরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা ?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, ক্ষিদে নেই বই কি ! কই দেখি তোর হাঁড়ি ?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্ন মুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। একহাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মাঠাকরুণ রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা, রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখল রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে!

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে, সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, ক্যাঙলার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে-পাড়ায় নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি না। বললি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখ ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম। আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল না, তখন উৎপাত, উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ

করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি ?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা !

না দিক গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল তা হলে। রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর, আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকার কেবল রুগ্ন-মাতার গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা-দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া ! কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি ! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত স্বর্গের রথ ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার !

কেন মা ?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে-কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্‌নে মা, বলিস্‌নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৩

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটাচারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন; খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসী পাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হয় না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনই ভাল হবো।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল

ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত চালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয় হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্ বাবা, বলিস্ মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপতে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস্ ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

৪

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ-সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেচে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত

বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর-একটু গতি করে দাও বাবা—ক্যাঙলার হাতে আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ-কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোট-জাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা এ কি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেচিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে, বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ নাড়িয়া জানাইল, এ-সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন ; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুস লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ ! বাঙলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোক ও উত্তেজনায় উদভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে ?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেচে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি ?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেচে—বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা এই কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি ! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবর-জল ছড়িয়ে দে ! কি জাতের ছেলে তুই ?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে ! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি ?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে ! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে সক্কলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি ?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি এক টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্ গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার !

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায় ! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত !

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন যে সে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকুরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ-ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েচে কি-না।

থাকে ত জালটাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়, হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে-বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতে ছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছেন তেনাকে আগুন দিতে।

তা দি গে না।

কাছারীর ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—না, মুখে একটু নুড়ো জেবলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দি গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড়ছেলে ব্যস্ত-সমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখচেন ভট্‌চাযমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘন্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মামলার ফল

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুড়া বৃন্দাবন সামন্তের মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া-লড়াই করিয়া মাস-ছয়েক একান্নে এক বাটীতে কাটাইল, তাহার পরে একদিন পৃথক হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাষ-বাস, জমি-জমা, পুকুর-বাগান সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোটভাই সুমুখের পুকুরের ওধারে খান-দুই মাটীর ঘর তুলিয়া ছোটবৌ এবং ছেলে-পুলে লইয়া বাস্তু ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট্ট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পাইল না। কারণ, শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই। ঘরদোর সব পুরানো হয়েচে, চালের বাতা-বাকারি বদলাতে, খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাঁয়ে কার কাছে চাইতে যাব বলুন?

শম্ভু প্রতিবাদের জন্য উঠিয়া বড় ভাইয়ের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, ওঁর ঘরে খোঁটাখুঁটিতেই বাঁশ চাই—আর আমার ঘরে কলাগাছ চিরে দিলেই হবে, না? সে হবে না, সে হবে না চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার না থাকলেই চলবে না, তা বলে দিচ্ছি।

মীমাংসা ঐ পর্য্যন্তই হইয়া রহিল। সুতরাং সম্পত্তিটা রহিল দুই শরিকের। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেই শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া হাঁটিলেই শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।

সেদিন সকালে এই বাঁশঝাড় উপলক্ষ্য করিয়াই উভয় পরিবারে তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ষষ্ঠীপূজা কিংবা এমনি একটা দৈবকার্য্যে বড়বৌ গঙ্গামণির কিছু বাঁশপাতার আবশ্যক ছিল। পল্লীগ্রামে এ বস্তুটি দুর্লভ নয়, অনায়াসে অন্যত্র সংগ্রহ হইতে পারিত, কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাহার সরম বোধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার মনে

ভরসা ছিল, দেবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাঠে গিয়াছে—ছোটবৌ একা আর করিবে কি।

কিন্তু কি কারণে শম্ভুর সেদিন মাঠে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে সবেমাত্র পান্তা-ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমনি সময়ে ছোটবৌ পুকুর-ঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শম্ভুর কোথায় রহিল জলের ঘটি—কোথায় রহিল হাত-মুখ ধোওয়া, সে রৈ-রাই শব্দে সমস্ত পাড়াটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো-হাতেই পাতা কয়টি কাড়িয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়ভাজের প্রতি যে-সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে-সকল সে আর যেখানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণের লক্ষ্মণ-চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এদিকে বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি গিয়া মাঠে স্বামীর নিকট খবর পাঠাইয়া দিল। শিবু লাঙ্গল ফেলিয়া কাস্তে হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বাঁশঝাড়ের অদূরে দাঁড়াইয়া অনুপস্থিত কনিষ্ঠের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ঘুরাইয়া চীৎকার করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইল যে, ভীড় জমিয়া গেল। তাহাতেও যখন ক্ষোভ মিটিল না, তখন সে জমিদার বাড়িতে নালিশ করিতে গেল এবং এই বলিয়া শাসাইয়া গেল যে চৌধুরীমশাই এর বিচার করেন ভালই, না হইলে সে সদরে গিয়া এক নম্বর রুজু করিবে—তবে তার নাম শিবু সামন্ত।

ওদিকে শম্ভু বাঁশপাতা-কাড়ার কর্তব্যটা শেষ করিয়াই মনের সুখে হাল গরু লইয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর নিষেধ শুনে নাই। বাটীতে ছোটবৌ একা। ইতিমধ্যে ভাশুর আসিয়া চীৎকারে পাড়া জড় করিয়া বীরদর্পে এক তরফা জয়ী হইয়া চলিয়া গেলেন, ভাদ্রবধূ হইয়া সে সমস্ত কানে শুনিয়াও একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না। ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও স্বামীর বিরুদ্ধে নতুন অভিমানের অবধি রহিল না। সে রান্নাঘরের দিকেও গেল না। বিরস-মুখে দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

শিবুর বাড়িতেও সেই দশা। বড়বৌ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। হয় সে ইহার একটা বিহিত করুক, নয় সে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। দু'টা বাঁশপাতার জন্যে দেওরের হাতে এত লাঞ্ছনা!

বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তখনও শিবুর দেখা নাই। বড়বৌ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, কি জানি চৌধুরীমশায়ের বাটী হইতেই বা তিনি এক নম্বর রুজু করিতে সোজা সদরে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় বাহিরের দরজায় ঝনাৎ করিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া শম্ভুর বড়ছেলে গয়ারাম প্রবেশ করিল। বয়স তাহার ষোল-সতের, কিংবা এমনি

একটা কিছু! কিন্তু এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাষাটা তাহার বাপকেও ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়ে। আজকাল মর্নিং-ইস্কুল, বেলা সাড়ে দশটায় ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে।

গয়ারামের যখন এক বৎসর বয়স তখন জননীর মৃত্যু হয়। তাহার পিতা শম্ভু পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিল বটে, কিন্তু এই মা মরা ছেলেটিকে মানুষ করিবার দায় জ্যাঠাইমার উপরেই পড়িল এবং এতকাল দুই ভাই পৃথক না হওয়া পর্য্যন্ত এ-ভার তিনিই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। বিমাতার সহিত তাহার কোনদিনই বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না—এমন কি, তাহার নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার পরেও গয়ারাম যেখানে যেদিন সুবিধা পাইত আহার করিয়া লইত।

আজ সে ইস্কুলের পর বাড়ি ঢুকিয়া বিমাতার মুখ এবং আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ এ বাড়িতে আসিতেছিল। জ্যাঠাইমার মুখ দেখিয়া তাহার সেই আগুনে জল পড়িল না, কেরোসিন পড়িল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, ভাত দে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কথা কহিলেন না, যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন।

ক্রুদ্ধ গয়ারাম মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া বলিল, ভাত দিবি, না দিবিনে, তা বল্!

গঙ্গামণি সক্রোধে মুখ তুলিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোর জন্যে ভাত রেঁধে বসে আছি—তাই দেব! বলি, তোর সৎমা আবাগী ভাত দিতে পারলে না যে এখানে এসেছিস্ হাঙ্গামা করতে?

গয়ারাম চেঁচাইয়া বলিল, সে আবাগীর কথা জানিনে। তুই দিবি কি না বল? না দিবি ত চললুম আমি তোর সব হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙ্গে দিতে। বলিয়া সে গোলার নীচে চ্যালাকাঠের গাদা হইতে একটা কাঠ তুলিয়া সবেগে রন্ধনশালার অভিমুখে চলিল।

জ্যাঠাইমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গয়া! হারামজাদা দস্যি! বাড়াবাড়ি করিসনে বলচি! দু'দিন হয়নি আমি নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি কেড়েচি, একটা-কিছু ভাঙলে তোর জ্যাঠাকে দিয়ে তোর একখানা পা যদি না ভাঙাই ত তখন বলিস্, হাঁ।

গয়ারাম রান্নাঘরের শিকলটায় গিয়া হাত দিয়াছিল, হঠাৎ একটা নূতন কথা মনে পড়ায় সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা ভাত না দিস্ না দিবি। আমি চাইনে। নদীর ধারে বটতলায় বামুনদের মেয়েরা সব ধামা ধামা চিঁড়ে-মুড়কি নিয়ে পুজো করচে, যে চাইচে দিচ্ছে দেখে এলুম। আমি চললুম তেনাদের কাছে।

গঙ্গামণির তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ অরণ্যষষ্ঠী, এবং একমুহূর্ত্তেই তাঁহার মেজাজ কড়ি হইতে কোমলে নামিয়া আসিল।

তথাপি মুখের জোর রাখিয়া কহিলেন, তাই যা না। কেমন খেতে পাস্ দেখি ?

দেখিস্ তখন, বলিয়া গয়া একখানা ছেঁড়া গামছা টানিয়া লইয়া কোমরে জড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই গঙ্গামণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে পরের ঘরে চেয়ে খেলে তোর কি দুর্গতি করি, তা দেখিস্ হতভাগা !

গয়া জবাব দিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া এক-খামচা তেল লইয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া জ্যাঠাইমা উঠানে নামিয়া আসিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন, দস্যি কোথাকার ! ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে গোঁয়ারতুমি। ডুব দিয়ে ফিরে না এলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি। আজ আমি রেগে রয়েচি।

কিন্তু গয়ারাম ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু দাঁত বাহির করিয়া জ্যাঠাইমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গঙ্গামণি তাহার পিছনে পিছনে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে কার ছেলে ভাত খায় যে, তুই ভাত খেতে চাস্ ? পাটালি-গুড়ের সন্দেশ দিয়ে, চাঁপাকলা দিয়ে, দুধ দই দিয়ে ফলার করা চলে না যে, তুই যাবি পরের ঘরে চেয়ে খেতে ? কৈবর্ত্তের ঘরে তুমি এমনি নবাব জন্মেচ ?

গয়া কিছু দূরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে তুই দিলিনি কেন পোড়ারমুখি ? কেন বললি, নেই ?

গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, শোন কথা ছেলের ! কখন্ আবার বললুম তোকে, কিছু নেই ? কোথায় চান, কোথায় কি, দস্যির মত ঢুকেই বলে, দে ভাত ! ভাত কি আজ খেতে আছে যে দেব ! আমি বলি, সবই ত মজুত, ডুবটা দিয়ে এলেই—

গয়া কহিল, ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাগীরা ঝগড়া করে রান্নাঘরের শেকল টেনে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকবে, আর রোজ আমি তিনপোর বেলায় ভাতে-ভাত খাব ? না আমি তোদের কারুর কাছে খেতে চাইনে, বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া গঙ্গামণি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে কারো কাছে চেয়ে খেয়ে অমঙ্গল করিস্‌নে গয়া—লক্ষ্মী বাপ আমার—না হয় চারটে পয়সা দেবো রে, শোন—

গয়ারাম ভ্রুক্ষেপও করিল না, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। বলিতে বলিতে গেল, চাইনে আমি ফলার, চাইনে আমি পয়সা। তোর ফলারে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে গঙ্গামণি বাড়ি ফিরিয়া রাগে দুঃখে, অভিমানে নির্জ্জীবের মত দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং

গয়ার কুব্যবহারে মর্মাহত হইয়া তাহার বিমাতার মাথা খাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নদীর পথে চলিতে চলিতে গয়ার জ্যাঠাইমার কথাগুলা কানে বাজিতে লাগিল। একে উত্তম আহারের প্রতি স্বভাবতঃই তাহার একটু অধিক লোভ ছিল। পাটালি-গুড়ের সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ, চাঁপাকলা—তাহার উপর চার পয়সা দক্ষিণা—মনটা তাহার দ্রুত নরম হইয়া আসিতে লাগিল।

স্নান সারিয়া গয়ারাম প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ফিরিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, ফলারের সব শীগ্‌গির নিয়ে আয় জ্যাঠাইমা—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে। কিন্তু পাটালি-সন্দেশ কম দিবি ত আজ তোকেই খেয়ে ফেলব।

গঙ্গামণি সেইমাত্র গরুর কাজ করিতে গোয়ালে ঢুকিয়াছিলেন। গয়ার ডাক শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ঘরে দুধ দই চিঁড়া গুড় ছিল বটে, কিন্তু চাঁপাকলাও ছিল না, পাটালি-গুড়ের সন্দেশও ছিল না। তখন গয়াকে আটকাইবার জন্য যা মুখে আসিয়াছিল তাই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলেন।

তিনি সেইখান হইতে সাড়া দিয়া কহিলেন, তুই ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছাড় বাবা, আমি পুকুর থেকে হাত ধুয়ে আসছি।

শীগ্‌গির আয়, বলিয়া হুকুম চালাইয়া গয়া কাপড় ছাড়িয়া নিজেই একটা আসন পাতিয়া ঘটিতে জল গড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া আসিয়া তাহার প্রসন্ন মেজাজ দেখিয়া খুশি হইয়া বলিলেন, এই ত আমার লক্ষ্মী ছেলে। কথায় কথায় কি রাগ করতে আছে বাবা! বলিয়া তিনি ভাঁড়ার হইতে আহারের সমস্ত আয়োজন আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

গয়ারাম চক্ষের পলকে উপকরণগুলি দেখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, চাঁপাকলা কই?

গঙ্গামণি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, ঢাকা দিতে মনে নেই বাবা, সব কটা ইঁদুরে খেয়ে গেছে। একটা বেড়াল না পুষলে আর নয় দেখচি।

গয়া হাসিয়া বলিল, কলা কখন ইঁদুরে খায়? তোর ছিল না তাই কেন বল্ না?

গঙ্গামণি অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি কথা রে। কলা ইঁদুরে খায় না?

গয়া চিঁড়া-দই মাখিতে মাখিতে বলিল, আচ্ছা খায়, খায়; কলা আমার দরকার নেই, পাটালি-গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আয়। কম আনিস্‌নি যেন।

জ্যাঠাইমা পুনরায় ভাঁড়ারে ঢুকিয়া মিছামিছি কিছুক্ষণ হাঁড়ি-কুঁড়ি

নাড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, যাঃ—এও ইঁদুরে খেয়ে গেছে বাবা, একফোঁটা নেই, কখন মন-ভুলাতে হাঁড়ির মুখ খুলে রেখেচি—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই গয়া চোখ পাকাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, পাটালি-গুড় কখন ইঁদুরে খায় রাক্ষসী—আমার সঙ্গে চালাকি? তোর যদি কিছু নেই, তবে কেন আমাকে ডাকলি।

জ্যাঠাইমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, সত্যি বলচি গয়া—

গয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, তবু বলচ সত্যি, যা—আমি তোর কিচ্ছু খেতে চাইনে, বলিয়া সে পা দিয়া টান মারিয়া সমস্ত আয়োজন উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি মজা, বলিয়া সে সেই চ্যালা-কাঠটা হাতে তুলিয়া ভাঁড়ারের দিকে ছুটিল।

গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন, কিন্তু চক্ষের নিমিষে ক্রুদ্ধ গয়ারাম হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া জিনিস-পত্র ছড়াইয়া একাকার করিয়া দিল। বাধা দিতে গিয়া তিনি হাতের উপর সামান্য একটু আঘাত পাইলেন।

ঠিক এমনি সময়ে শিবু জমিদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল। হাঙ্গামা শুনিয়া চীৎকার-শব্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গঙ্গামণি স্বামীর সাড়া পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং গয়ারাম হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

শিবু ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি?

গঙ্গামণি কাঁদিয়া কহিল, গয়া আমার সর্ব্বস্ব ভেঙ্গে দিয়ে হাতে আমার এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে—এই দেখ ফুলে উঠেচে। বলিয়া সে স্বামীকে হাতটা দেখাইল।

শিবুর পশ্চাতে তাহার ছোট-সম্বন্ধী ছিল। হুঁসিয়ার এবং লেখাপড়া জানে বলিয়া জমিদার-বাটীতে যাইবার সময় শিবু তাহাকে ও-পাড়া হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কহিল, সামন্তমশাই, এ সমস্ত ঐ ছোট-সামন্তর কারসাজি। ছেলেকে দিয়ে সে-ই এ-কাজ করিয়েচে। কি বল দিদি, এই নয়?

গঙ্গামণির তখন অন্তর জ্বলিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক ভাই। ওই মুখপোড়াই ছোঁড়াকে শিখিয়ে দিয়ে আমাকে মার খাইয়েচে। এর কি করবে তোমরা কর, নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

এত বেলা পর্য্যন্ত শিবুর নাওয়া-খাওয়া নাই, জমিদারের কাছেও সুবিচার হয় নাই, তাহাতে বাড়িতে পা দিতে না দিতে এই কাণ্ড, তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। সে প্রচণ্ড একটা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চললুম থানায় দারোগার কাছে। এর বিহিত না করতে পারি ত আমি বিন্দু সামন্তর ছেলে নই।

তাহার শালা লেখাপড়া-জানা লোক, বিশেষতঃ তাহার গয়ার উপর আগে হইতেই আক্রোশ ছিল। সে কহিল, আইন-মতে এর নাম অনধিকার-প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ি চড়াও হওয়া, জিনিসপত্র ভাঙা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—এর শাস্তি ছ'মাস জেল। সামন্তমশাই, তুমি কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি, আমি কেমন না বাপবেটাকে একসঙ্গে জেলে পুরতে পারি।

শিবু আর দ্বিরুক্তি করিল না, সম্বন্ধীর হাত ধরিয়া থানার দারোগার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গঙ্গামণির সকলের চেয়ে বেশি রাগ পড়িয়াছিল দেবর ও ছোটবধূর উপর। সে এই লইয়া একটা হুলস্থূল করিবার উদ্দেশ্যে কপাটে শিকল তুলিয়া দিয়া সেই চ্যালাকাঠ হাতে করিয়া সোজা শম্ভুর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেমন গো ছোটকর্ত্তা, ছেলেকে দিয়ে আমাকে মার খাওয়াবে! এখন বাপ-বেটায় একসঙ্গে ফাটকে যাও!

শম্ভু সেইমাত্র তাহার এ-পক্ষের ছেলেটাকে লইয়া ফলার শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বড়ভাজের মূর্ত্তি এবং তাহার হাতের চ্যালা-কাঠটা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কহিল, হয়েচে কি? আমি ত কিছুই জানিনে!

গঙ্গামণি মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। দারোগা আসচে, তার কাছে গিয়ে ব'লো, কিছুই জান কি না।

ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া একটি খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। শম্ভু মনে মনে ভয় পাইয়া কাছে আসিয়া গঙ্গামণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, মাইরি বলচি বড়বৌঠান, আমরা কিছুই জানিনে।

কথাটা যে সত্য, বড়বৌ তাহা নিজেও জানিত, কিন্তু তখন উদারতার সময় নয়। সে শম্ভুর মুখের উপরেই ষোল-আনা দোষ চাপাইয়া, সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া গয়ারামের কীর্ত্তি বিবৃত করিল। এই ছেলেটাকে যাহারা জানে, তাহাদের পক্ষে ঘটনাটা অবিশ্বাস করা শক্ত।

স্বল্পভাষিণী ছোটবৌ এতক্ষণে মুখ খুলিল; স্বামীকে কহিল, ক্যামন, যা বলেছিনু তাই হ'লো কি না—কতদিন বলি, ওগো, দস্যি ছোঁড়াটাকে আর ঘরে ঢুকতে দিয়োনি; তোমার ছোট ছেলেটাকে না-হক মেরে মেরে কোনদিন খুন করে ফেলবে! তা গেরাহ্যিই হয় না—এখন কথা খাটল ত?

শম্ভু অনুনয় করিয়া গঙ্গামণিকে কহিল, আমার দিব্যি বড়বৌঠান, দাদা সত্যি নাকি থানায় গেছে?

তাহার করুণ কণ্ঠস্বরে কতকটা নরম হইয়া বড়বৌ জোর দিয়া বলিল, তোমার দিব্যি ঠাকুরপো, গেছে, সঙ্গে আমাদের পাঁচুও গেছে।

শম্ভু অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ছোটবৌ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, নিত্যি বলি দিদি, কোথায় যে নদীর ওপর সরকারি পুল

হচ্ছে, কত লোক খাটতে যাচ্ছে, সেথায় নিয়ে গিয়ে ওরে কাজে লাগিয়ে দাও। তারা চাবুক মারবে আর কাজ করাবে—পালাবার জোটি নেই—দু'দিনে সোজা হয়ে যাবে। তা না—ইস্কুলে দিয়েচি পড়ুক। ছেলে যেন ও'র উকিল-মোক্তার হবে।

শম্ভু কাতর হইয়া বলিল, আরে সাধে দিইনি সেখানে! সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়, অর্দ্ধেক লোক মাটি চাপা হয়ে কোথায় তলিয়ে যায় তার তল্লাশই মেলে না।

ছোটবৌ বলিল, তবে বাপ-ব্যাটাতে মিলে ফাটকে খাট গে যাও।

বড়বৌ চুপ করিয়া রহিল। শম্ভু তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি কালই ছোঁড়াকে নিয়ে গিয়ে পাঁচলার পুলে কাজে লাগিয়ে দেব বৌঠান, দাদাকে ঠাণ্ডা কর। আর এমন হবে না।

তাহার স্ত্রী কহিল, ঝগড়াঝাঁটি ত শুধু ঐ ড্যাকরার জন্যে। তোমাকেও ত কতবার বলিচি দিদি, ওরে ঘরেদোরে ঢুকতে দিয়ো না—আস্কারা দিয়ো না। আমি বলিনে তাই, নইলে ও-মাসে তোমাদের মর্ত্তমান কলার কাঁদিটে রাত্তিরে কে কেটে নিয়েছিল? সে ত ঐ দস্যি। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে কি চলে? পুলের কাজে পাঠিয়ে দাও, পাড়া জুড়ুক।

শম্ভু প্রতিজ্ঞা করিল যে, কাল যেমন করিয়া হোক ছোঁড়াকে গ্রাম-ছাড়া করিয়া তবে সে জল-গ্রহণ করিবে।

গঙ্গামণি এ-কথাতেও কোন কথা কহিল না, হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

স্বামী ভাই এখনও অভুক্ত। অপরাহ্নবেলায় সে বিষন্ন-মুখে রান্না-ঘরের দোরে বসিয়া তাহাদেরই খাবার আয়োজন করিতেছিল, গয়ারাম উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া নিঃশব্দপদে প্রবেশ করিল। বাটীতে আর কেহ নাই দেখিয়া সে সাহসে ভর করিয়া একেবারে পিছনে আসিয়া ডাক দিল, জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। গঙ্গারাম অদূরে ক্লান্তভাবে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, আচ্ছা যা আছে তাই দে, আমার বড্ড খিদে পেয়েচে।

খাবার কথায় গঙ্গামণির শান্ত ক্রোধ মুহূর্ত্তে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়াই সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া! পোড়ারমুখো! আবার আমার কাছে এসেচিস ক্ষিদে বলে? দূর হ এখান থেকে।

গয়া কহিল, দূর হব তোর কথায়?

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া কহিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার! আমি আবার দেব খেতে?

গয়া বলিল, তুই দিবিনে ত কে দেবে? কেন তুই ইঁদুরের দোষ দিয়ে

মিছে কথা বললি ? কেন ভাল করে বললিনি, বাবা, এই দিয়ে খা, আজ আর কিছু নেই। তা হলে ত আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শীগ্‌গির রাক্ষুসী, আমার পেট যে জলে গেল !

জ্যাঠাইমা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মনে মনে একটু নরম হইয়া বলিলেন, পেট জ্বলে থাকে তোর সৎমার কাছে যা।

বিমাতার নামে গয়া চক্ষের পলকে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, সে আবাগীর নাকি আমি আর মুখ দেখব ? শুধু ঘরে আমার ছিপ্‌টা আনতে গেছি, বলে, দূর ! দূর ! এইবার জেলের ভাত খে গে যা ! আমি বললুম, তোদের ভাত আমি খেতে আসিনি—আমি জ্যাঠাইমার কাছে যাচ্ছি। পোড়ারমুখী কম শয়তান ! ঐ গিয়ে লাগিয়েচে বলেই ত বাবা তোর হাত থেকে বাঁশ-পাতা কেড়ে নিয়েচে ! বলিয়া সে সজোরে মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া কহিল, তুই রাক্ষুসী নিজে পাতা আনতে গিয়ে অপমান হলি ? কেন আমায় বললিনি ? ঐ বাঁশঝাড় সমস্ত আমি যদি না আগুন দিয়েই পোড়াই ত আমার নাম গয়া নয়, তা দেখিস ! আবাগী আমাকে বললে কি জানিস জ্যাঠাইমা ? বললে, তোর জ্যাঠাইমা থানায় খবর পাঠিয়েচে, দারোগা এসে বেঁধে নিয়ে তোকে জেল দেবে। শুনলি কথা হতভাগীর ?

গঙ্গামণি কহিলেন, তোর জ্যাঠামশাই পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেই ত থানায়। তুই আমার গায়ে হাত তুলিস—এতবড় তোর আস্পর্ধা ?

পাঁচুমামাকে গয়া একেবারে দেখিতে পারিত না। সে আবার যোগ দিয়াছে শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুই রাগের সময় আমায় আটকাতে গেলি ?

গয়ামণি বলিলেন, তাই আমাকে মারবি ? এখন যা, ফাটকে বাঁধা থাক্ গে যা।

গঙ্গা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, ইঃ—তুই আমাকে ফাটকে দিবি ? দে না, দিয়ে একবার মজা দেখ্ না ! আপনি কেঁদে কেঁদে মরে যাবি—আমার কি হবে !

গঙ্গামণি কহিলেন, আমার বয়ে গেছে কাঁদতে। যা, আমার সুমুখ থেকে যা বলচি, শত্তুর বালাই কোথাকার।

গয়া চেঁচাইয়া কহিল, তুই আগে খেতে দে না, তবে ত যাব। কখন্ সাত-সকালে দুটি মুড়ি খেয়েচি বল্ ত ? ক্ষিদে পায় না আমার ?

গঙ্গামণি কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবু পাঁচুকে লইয়া থানা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং গয়ার প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল, হারামজাদা পাজী, আবার আমার বাড়ি ঢুকেচে ! বেরো, বেরো বলচি ! পাঁচু, ধর্ ত শুয়োরকে।

বিদ্যুদ্বেগে গয়ারাম দরজা দিয়া দৌড় মারিল। চেঁচাইয়া বলিয়া

গেল—পেঁচোশালার একটা ঠ্যাং না ভেঙ্গে দিই ত আমার নামই গয়ারাম নয়।

চক্ষের পলকে এই কান্ড ঘটিয়া গেল। গঙ্গামণি একটা কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না।

ক্রুদ্ধ শিবু স্ত্রীকে বলিল, তোর আস্কারা পেয়েই ও এমন হচ্চে। আর যদি কখন হারামজাদাকে বাড়ি ঢুকতে দিস ত তোর অতি বড় দিব্যি রইল।

পাঁচু বলিল, দিদি তোমাদের কি, আমারই সর্ব্বনাশ। কখন রাত-ভিতে লুকিয়ে আমার ঠ্যাঙেই ও ঠ্যাঙা মারবে দেখচি।

শিবু কহিল, কাল সকালেই যদি না পুলিশ-পেয়াদা দিয়ে ওর হাতে দড়ি পরাই ত আমার—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঙ্গামণি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভীতু পাঁচকড়ি সে-রাত্রে আর বাড়ী গেল না। এইখানে শুইয়া রহিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্রোশ-দুই দূরের পথ হইতে দারোগাবাবু উপযুক্ত দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া পাল্কী চড়িয়া কনেস্টবল ও চৌকিদারাদি সমভিব্যাহারে সরজমিনে তদন্ত করিতে উপস্থিত হইলেন। অনধিকার-প্রবেশ, জিনিস-পত্র তছরুপাত, চ্যালাকাঠের দ্বারা স্ত্রীলোকের অঙ্গে প্রহার—ইত্যাদি বড় বড় ধারার অভিযোগ—সমস্ত গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

প্রধান আসামী গয়ারাম—তাহাকে কৌশলে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিতেই সে কনেস্টবল, চৌকিদার প্রভৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেউ দেখতে পারে না বলে আমাকে ফাটকে দিতে চায়।

দারোগা বুড়ামানুষ। তিনি আসামীর বয়স এবং কান্না দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে না গয়ারাম?

গয়া কহিল, আমাকে শুধু আমার জ্যাঠাইমা ভালবাসে, আর কেউ না।

দারোগা প্রশ্ন করিল, তবে জ্যাঠাইমাকে মেরেছ কেন?

গয়া বলিল, না, মারিনি। কপাটের আড়ালে গঙ্গামণি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া কহিল, তোকে আমি কখন মেরেচি জ্যাঠাইমা?

পাঁচু নিকটে বসিয়াছিল, সে একটু কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দিদি, হুজুর জিজ্ঞেসা করচেন, সত্যি কথা বল। ও কাল দুপুরবেলা বাড়ি চড়াও হয়ে—কাঠের বাড়ি তোমাকে মারেনি? ধর্ম্মাবতারের কাছে যেন মিথ্যা কথা ব'লো না।

গঙ্গামণি অস্ফুটে যাহা কহিলেন, পাঁচু তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিল, হাঁ হুজুর, আমার দিদি বলচেন, ও মেরেচে।

গয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, দ্যাখ্ পেঁচো, তোর আমি না পা ভাঙি ত—রাগে কথাটা তার সম্পূর্ণ হইতে পাইল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখলেন হুজুর! দেখলেন! হুজুরের সুমুখেই বলচে পা ভেঙ্গে দেবে—আড়ালে ও খুন করতে পারে। ওকে বাঁধবার হুকুম হোক।

দারোগা শুধু একটু হাসিলেন। গয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমার মা নেই তাই। নইলে—এবারেও, কথাটা তাহার শেষ হইতে পারিল না। যে মাকে তাহার মনেও নাই, মনে করিবার কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় আসামী শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রমাণ হইল না। দারোগাবাবু আদালতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়া রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু মামলা চালানো, তাহার যথারীতি তদ্বিরাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহার ভগিনীর প্রতি গুরুতর অত্যাচারের জন্য গয়ার যে কঠিন শাস্তি হইবে, এই কথা চতুর্দ্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু গয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিবুর এই আচরণে নিন্দা করিতে লাগিল। শিবু তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, শিবুর স্ত্রী একেবারে চুপচাপ।

সেদিন গয়ার দূর-সম্পর্কের এক মাসি খবর শুনিয়া শিবুর বাড়ি বহিয়া তাহার স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালি-গালাজ করিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গামণি একেবারে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

শিবু পাশের বাড়ির লোকের কাছে এ-কথা শুনিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীকে কহিল, তুই চুপ করে রইলি? একটা কথাও বললিনে?

শিবুর স্ত্রী কহিল, না।

শিবু বলিল, আমি বাড়ি থাকলে মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে ছেড়ে দিতুম।

তাহার স্ত্রী কহিল, তা হলে আজ থেকে বাড়িতেই বসে থেকো, আর কোথাও বেরিও না। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সেদিন দুপুরবেলায় শিবু বাড়ি ছিল না। শম্ভু আসিয়া বাঁশঝাড় হইতে গোটাকয়েক বাঁশ কাটিয়া লইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া শিবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল। কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাকুক আজ সে কাছেও ঘেঁষিল না, নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গেল। দিন-দুই পরে সংবাদ শুনিয়া শিবু লাফাইতে লাগিল। স্ত্রীকে আসিয়া কহিল, তুই কি

কানের মাথা খেয়েচিস ? ঘরের পাশ থেকে সে বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, আর তুই টের পেলি না ?

তাহার স্ত্রী বলিল, কেন টের পাব না, আমি চোখেই ত সব দেখিচি।

শিবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তবু আমাকে তুই জানালিনে ?

গঙ্গামণি বলিল, জানাব আবার কি ? বাঁশঝাড় কি তোমার একার ? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ নেই ?

শিবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শুধু কহিল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

সেদিন সন্ধ্যার পর পাঁচু সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্তভাবে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। শিবু গরুর জন্য খড় কুচাইতেছিল, অন্ধকারে তাহার মুখের চোখের চাপা হাসি লক্ষ্য করিল না—সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'লো ?

পাঁচু গাম্ভীর্য্যের সহিত একটু হাস্য করিয়া কহিল, পাঁচু থাকলে যা হয় তাই। ওয়ারিণ্ট বের করে তবে আসচি। এখন কোথায় আছে জানতে পারলেই হয়।

শিবুর একপ্রকার ভয়ানক জিদ চড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, যত খরচ হোক ছোঁড়াকে ধরাই চাই। তাকে জেলে পুরে তবে আমার অন্য কাজ। তার পরে উভয়ের নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, ভিতর হইতে আহারের আহ্বান আসে না দেখিয়া শিবু আশ্চর্য্য হইয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী মেজের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবার হয়ে গেছে ত আমাদের ডাকিস্‌নি কেন ?

গঙ্গামণি ধীরে-সুস্থে পাশ ফিরিয়া বলিল, কে রাঁধলে যে খাবার হয়ে গেছে ?

শিবু তর্জ্জন করিয়া প্রশ্ন করিল, রাঁধিস্ নি এখনো ?

গঙ্গামণি কহিল, না। আমার শরীর ভাল নেই, আজ আমি পারব না।

নিদারুণ ক্ষুধায় শিবুর নাড়ী জ্বলিতেছিল, সে আর সহিতে পারিল না। শায়িত স্ত্রীর পিঠের উপর একটা লাথি মারিয়া বলিল, আজকাল রোজ অসুখ, রোজ পারব না! পারবিনে ত বেরো আমার বাড়ি থেকে।

গঙ্গামণি কথাও কহিল না, উঠিয়াও বসিল না। যেমন শুইয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে শালা-ভগিনীপতি কাহারও খাওয়া হইল না।

সকালবেলা দেখা গেল গঙ্গামণি বাটীতে নাই। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর পাঁচু কহিল, দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি চলে গেছে।

স্ত্রীর এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু শিবু মনে মনে বুঝিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরক্তিও যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, নালিশ-মোকদ্দমার প্রতি ঝোঁকও তেমনি খাটো হইয়া আসিতেছিল। সে শুধু বলিল, চুলোয় যাক, আমার খোঁজবার দরকার নেই।

বিকেলবেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গামণি বাপের বাড়ি যায় নাই। পাঁচু ভরসা দিয়া কহিল, তাহলে নিশ্চয় পিসিমার বাড়ি চলে গেছে।

তাহাদের এক বড়লোক পিসি ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে একটা গ্রামে বাস করিতেন। পূজা-পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে গঙ্গামণিকে লইয়া যাইতেন। শিবু স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে মুখে বলিল বটে, যেখানে খুশি যাক গে! মরুক গে! কিন্তু ভিতরে অনুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবুও রাগের উপর দিন পাঁচ-ছয় কাটিয়া গেল। এদিকে কাজ-কর্ম লইয়া, গরু-বাছুর লইয়া সংসার তাহার একপ্রকার অচল হইয়া উঠিল। একটাদিনও আর কাটে না এমন হইল।

সাতদিনের দিন সে আপনি গেল না বটে, কিন্তু নিজের পৌরুষ বিসর্জ্জন দিয়া পিসির বাড়িতে গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

পরদিন শূন্য গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সেখানে কেহ নাই। শিবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সারাদিন স্নানাহার নাই, মড়ার মত একটা তক্তপোষের উপর পড়িয়াছিল, পাঁচু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সামন্তমশাই সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু ধড়্মড়্ করিয়া বসিয়া কহিল, কোথায়? কে খবর দিলে? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি ত? গাড়ী নিয়ে চল্ না এখুনি দু'জনে যাই।

পাঁচু বলিল, দিদির কথা নয়—গয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু আবার শুইয়া পড়িল, কোন কথা কহিল না।

তখন পাঁচু বহুপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে, এ সুযোগ কোনও মতে হাতছাড়া করা উচিত নয়। দিদি ত একদিন আসবেই, কিন্তু তখন আর এ-ব্যাটাকে বাগে পাওয়া যাবে না।

শিবু উদাসকণ্ঠে বলিল, এখন থাক্ গে পাঁচু! আগে সে ফিরে আসুক, তার পরে—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, তার পরে কি আর হবে সামন্তমশাই, বরঞ্চ দিদি ফিরে আসতে না আসতে কাজটা শেষ করা চাই। সে এসে পড়লে হয়ত -ার হবেই না।

শিবু রাজি হইল। কিন্তু আপনার খালিঘরের দিকে চাহিয়া পরের

উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোনমতে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখন পাঁচুর জোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।

পরদিন রাত্রি থাকিতেই তাহারা আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে পাঁচু জানাইল, বহু দুঃখে খবর পাওয়া গেছে, শম্ভু তাহাকে পাঁচলার সরকারী পুলের কাজে নাম ভাঁড়াইয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে—সেইখানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

শিবু বরাবর চুপ্ করিয়াই ছিল, তখনও চুপ করিয়া রহিল।

তাহারা গ্রামে যখন প্রবেশ করিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রামের একপ্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ, লোকজন, লোহা-লক্কড়, কল-কারখানায় পরিপূর্ণ—সর্ব্বত্রই ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া জন-মজুরেরা বাস করিতেছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন কহিল, যে ছেলেটি সাহেবের বাংলা লেখা-পড়ার কাজ করচে, সে ত? তার ঘর ঐ যে, বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র কুটীর দেখাইয়া দিল, তাহারা গুঁড়ি মারিয়া পা টিপিয়া অনেক কষ্টে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গয়ারামের গলা শুনিতে পাওয়া গেল। পাঁচু পুলকে উল্লসিত হইয়া পেয়াদা এবং শিবুকে লইয়া বীরদর্পে অকস্মাৎ কুটীরের উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তাহার সমস্ত মুখ বিস্ময়ে, ক্ষোভে নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার দিদি ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়ারাম ভোজনে বসিয়াছে।

শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসো গে, আমি ততক্ষণ আর এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।

তাসের ঘর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ, পেয়ালা, চাদানি ইত্যাদি রঙ-চঙ করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের করো।

কলিকাতা-প্রবাসী, হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন. চায়ের সেটটা আজ বের কর তো গৌরী।

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান-সিলভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন-মা, আর একটা কাপ কি হল? এই দেখ বাপু, সবে এই আমি বের করে আনছি, আমায় দোষ দিও না যেন।

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না।

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল—সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ। তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়ত কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না। পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা, বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকলেন?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তেলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মত সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউড়িদের, না ডোমেদের ?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কি হল ?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ও আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কি আর বলব বল !

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই নীরবে সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবার তৈরি করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও তোমাদের দেশের মত খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরই মাছের পুর দোব তো মা ?

—অ্যাঁ, মাছের পুর ? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না।

ময়দার ঠোলার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিঙ দেওয়া হত—ভারি চমৎকার হত। বাবার আমার হিঙ ভিন্ন কোনো জিনিস ভালো লাগে না। আর যে-সে হিঙ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না ; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ী বললেন, পশ্চিম ভালো যায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সে সব জিনিস পাওয়া যায় ?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিঙ পাওয়া যায় না মা। কাবুলীরা সে সব নিজেদের জন্য আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকাকড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিঙ, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিঙ—এ সব ছোট ছোট

ঝুড়ির এক এক ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও-ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ীর গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলের ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টিমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে, তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি, মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়ত বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কন নি। শেষে মা আবার বলে কয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাত-কাটা—এতটুকু। তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ!

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন; নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে।

শৈল বলিল, ছোট মাছ— কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক সিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষনো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও, সেরে নিয়ে চুল-টুল বেঁধে ফেল গে।

কেশপ্রসাধন-অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—উঃ, রঙ বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকেও দিতাম।

আমার আর কি রঙ দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রঙ কাকে বলে ; ঠিক একেবারে গোলাপফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়েও ফরসা রঙ ?

—হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা, হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মত।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মত বউ হয়েছে তোমার দিদি। লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি ?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল, তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কি যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না। আমার বউরা তো কলেজে পড়ছিল সব ; বিয়ের পর আমি সব ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনেরা সব ভালো করে পড়ছে ; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাতশ টাকার বই কেনেন—বাঙলা, ইংরিজী! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজনেস আছে—সেই বিজনেস দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নাই।

—কোথায় তোমার বাপের বাড়ি ?

—এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কণ্ট্রাক্টরি করেন।

—কি রকম পান-টান ?

—আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজভাই বলেন মাঝে মাঝে, এরকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টাঙায় চড়ে কাজ দেখে

বেড়াবেন, মোটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি, গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসাবে সন্ন্যাসী!

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী একবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তাহলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন কথায় কে যে আঘাত পায়, সে বোঝা বোধকরি, বিধাতারও সাধ্য নয়। 'তোমাদের চেয়ে বড় ঘর'—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের এই, বাপেদের ওই ; কিন্তু তত্ত্ব-তল্লাসও দেখি না, আজ দুবছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই।

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন আমার বলে ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে উঠে না ; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন, তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কি বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন কালে?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা ; আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন—একশ, পঞ্চাশ, আশী—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। কই ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, তোমায় হয়ত বলে নি অমর। দরকার হয়েছে শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তাহার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তাহার পরিধি,

তবুও সে স্বাধীন ; তাই মাসে দুইবার করিয়া সে বাড়ি আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অসচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপও করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরিয়া থাকে, মনের আগুনও নিবিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালোভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিসে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বারবার সঙ্কল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোনো কথা লিখিতে পারে নাই—কোনো অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে। তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে ; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মত নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলীর সহিত।

—এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু আনা দিলাম—আবার কত দেব ?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায় ? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়ালেন—এই, ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে—দ্যান, দিতে হবে।

—নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা, কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

—দেখ না, লোকসান যেদিন হয়, সেদিন এমনি করেই হয়। পঞ্চাশটা টাকা একজন মেরে দিয়ে পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান।

মাও বোধকরি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে তোমার চিন্তা কি বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাকে লেখ, তিনিই পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশ পঞ্চাশ আশী, যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বলিয়া উঠিল, কে, কোন হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কি করিবে, কি বলিবে, কোনো নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শাশুড়ী আবার বলিলেন, চুপ করে রইলে কেন, বল, উত্তর দাও?

শৈল বিহ্বলের মত বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো।

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মত দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে—স্বেচ্ছাচার। তাই ওইটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল,—সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কি করব বল ?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা। তার ওপর হৈমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী ? জামাই ?

শৈল বিবর্ণ মুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

—কই সে—ওমা, বাইরে কেন সে ?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ তো, বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো। বল—মা ডাকছেন।

শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন সেখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই কেউ তো নেই !

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি ? কোথায় গেল সে ?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন।—ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে, সে কি ?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে ; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফেরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধহয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা। সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, সময়ে পেঁছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখিন পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট ; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে, শৈলী কখন, অ্যাঁ ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই তো দাদা। ভালো আছেন আপনি ?

—হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাঙলা দেশের মানুষ—কই, দে তো চারগুলো তৈরি করে, দেখি, তোর হাতের কেমন পয় ! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব।

—তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না-রে?

—আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ—আধ মণ, পনের সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ। জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠার সের কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে। ওরে বাপ রে, সে যা আমার ভয়! এখন আর আমার ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

—যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস, তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা, দেখব, আমাদেরও কলিকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনেছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না। তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ।

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি। শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধু প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখলেন—আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কি ঘটিয়াছে, শৈল কি অপরাধ করিয়াছে! কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোনো কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই কোনো আশীর্বাদ তো আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোনো

পত্র দেন না! দয়া করিয়া, কি ঘটিয়াছে, আমাকে জানাইবেন; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি. এ.-তে সে যোগ্যস্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চক্ষে জল আসিল।

মনে তাঁহার ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মত মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন—কলিকাতায় বাড়ি ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোনো অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবা মাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধ হয় ধরা পড়ে নি। এগুলো মাঝলাজাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হল। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো আর কারও হয় না!

রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কি বল তো?—'একটি বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোল-আনা একটাও তো পুকুর নেই, 'অথচ—ছিঃ! আর, 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে, আমার জন্য ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া'—ও কি—ও কি, কাঁদছ কেন, শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কথা যে অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

উৎকোচ তত্ত্ব

রাজশেখর বসু

লোকনাথ পাল জেলা জজ, অতি ধর্মভীরু খুঁতখুঁতে লোক। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন পাছে ধূর্ত লোকে তাঁকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। ছ মাস পরেই তাঁকে অবসর নিতে হবে, জজিয়তির শেষ পর্যন্ত যাতে দুর্নীতির লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ না করে সে সম্বন্ধে তিনি খুব সতর্ক। উৎকোচ তত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা তাঁর আছে, সময় পেলেই তার জন্যে তিনি একটি খাতায় নোট লিখে রাখেন। আজ রবিবার, অবসর আছে। সকালবেলা একতলায় তাঁর অফিসঘরে বসে লোকনাথ নোট লিখছেন।—

কৌটিল্য বলেছেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, তা জানা যায় না। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি—ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে ঘুষ নিচ্ছে। পাপ সব সময় স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অনেক সময় সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, তখন তার স্বরূপ চেনা বড়ই কঠিন। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ আর নিষ্কাম উপহার—এদের প্রভেদ নির্ণয় সকল ক্ষেত্রে করা যায় না। মনে করুন, রামবাবু একজন উচ্চপদস্থ লোক, তাঁর অফিসে একটি ভাল চাকরি খালি আছে। যোগ্যতম প্রার্থীকেই মনোনীত করা তাঁর কর্তব্য। শ্যামবাবুর জামাই একজন প্রার্থী, যথানিয়মে দরখাস্ত করেছে। শ্যামবাবু রামবাবুকে বললেন, আপনার হাতেই তো সব, দয়া করে আমার জামাইকেই সিলেক্ট করবেন, হাজার টাকা দিচ্ছি, বাহাল হয়ে গেলে আরও হাজার দেব। এ হল অতি স্থূল ঘুষ, নির্লজ্জ পাকা ঘুষখোর কিংবা দুর্বলচিত্ত লোভী ভিন্ন কেউ নিতে রাজী হয় না। অথবা মনে করুন, রামবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এক হাঁড়ি সন্দেশ এনে শ্যামবাবু বললেন, কাশী থেকে আমার মা এনেছেন, খেয়ো। আমার জামাইকে তো তুমি দেখেছ, অতি ভাল ছোকরা। তার দরখাস্তটা একটু বিবেচনা করে দেখো ভাই, তোমাকে আর বেশী কি বলব। এও স্থূল ঘুষ, যদিও পরিমাণে তুচ্ছ। কিন্তু ধরুন কোনও অনুরোধ না করে শ্যামবাবু এক গোছা গোলাপফুল দিয়ে বললেন, আমাদের মধুপুরের বাগানে হয়েছে। এ হল সূক্ষ্ম ঘুষ, এর ফল নিতান্ত অনিশ্চিত, তবে নিরাপদ জেনেই শ্যামবাবু দিতে সাহস করেছেন। —আশা করেন এতেই রামবাবুর মন ভিজবে। আবার মনে করুন, রামবাবুর মেয়ের অসুখ, শ্যামবাবুর স্ত্রী এসে দিন রাত

সেবা করলেন, অসুখও সারল। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সেবা অনুচ্চারিত অনুরোধ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ঘুষ হতে পারে, অথবা নিঃস্বার্থ পরোপকারও হতে পারে, স্থির করা সোজা নয়। রামবাবু যদি দৃঢ়চিত্ত সাধুপুরুষ হন তবে শ্যামের জামাই-এর প্রতি কিছুমাত্র পক্ষপাত করবেন না, তবে অন্যভাবে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কিন্তু রামবাবু যদি বন্ধুবৎসল কোমলপ্রকৃতির লোক হন তবে শ্যাম-গৃহিণীর সেবা হয়তো জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁকে প্রভাবিত করবে। এ ছাড়া বাঙ্ময় ঘুষ আছে যার আর্থিক মূল্য নেই, অর্থাৎ খোশামোদ বা প্রশংসা। নিপুণভাবে প্রয়োগ করলে বুদ্ধিমান সাধুলোকও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়—

লোকনাথের নোট লেখায় বাধা পড়ল। দরজা ঠেলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে এসে বললেন, কেমন আছ লোকনাথ বাবাজী, অনেক কাল তোমাদের দেখি নি। সেকি, চিনতে পারছ না? আরে আমি হলুম তোমাদের মোহিত পিসেমশাই, বেহালার মোহিত সমজ্দার। কই রে পারুল কোথা আছিস, এদিকে আয় না মা।

হাঁকডাক শুনে লোকনাথ-গৃহিণী পারুলবালা এলেন। আগন্তুক লোকটিকে চিনতে তাঁরও কিছু দেরী হল। তার পর মনে পড়লে প্রণাম করে বললেন, মোহিত পিসেমশাই এসেছেন! উঃ কি ভাগ্যি!

অগত্যা লোকনাথও একটা নমস্কার করলেন।

মোহিত সমজ্দার হাঁক দিলেন, রামকন, জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আয় বাবা। মোহিতবাবুর অনুচর বাইরে অপেক্ষা করছিল, এখন ঘরে এসে মনিবের সামনে চারটে বাণ্ডিল রাখল।

একটা কার্ডবোর্ড বাক্স পারুলবালার হাতে দিয়ে মোহিতবাবু বললেন, আসল কাশ্মীরী শাল, তোর জন্যে এনেছি, দেখ তোর পছন্দ হয় কিনা।

শাল দেখে পারুলবালা আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললেন, চমৎকার, অতি সুন্দর!

মোহিতবাবু বললেন, লোকনাথ বাবাজী, তোমার তো কোনও শখই নেই, শুধু বই আর বই। তাই একটা ওআলনট কাঠের কিতাবদান মানে বুক র‍্যাক এনেছি। আর এই বাক্সটায় কয়েক গজ কাশ্মীর তাফতা আছে, একটা শাড়ি আর গোটা দুই ব্লাউজ হতে পারবে। আর এই চুবড়িটায় কিছু মেওয়া আছে, পেস্তা বাদাম, আখরোট কিশমিশ মনাক্কা এই সব।

কুণ্ঠিত হয়ে লোকনাথ বললেন, আহা কেন এত সব এনেছেন, এ যে বিস্তর টাকার জিনিস। না না, এসব দেবেন না।

মোহিতবাবু বললেন, আরে খরচ করলেই তো টাকা সার্থক হয়। তোমরা আমার স্নেহপাত্র, তোমাদের দিয়ে যদি আমার তৃপ্তি হয় তবে দেব না কেন, তোমরাই বা নেবে না কেন?

পারুলবালা বললেন, নেব বই কি পিসেমশাই, আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নেব। তার পর, এখন কোথা থেকে আসা হল? দিল্লি থেকে? পিসিমাকে আনলেন না কেন? তিনি আর ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছেন তো?

—সব ভাল। তাদের একদিন নিশ্চয় আনব। অনেক কাল পরে কলকাতায় এলুম, বেহালার বাড়িখানা যাচ্ছেতাই নোঙরা করে রেখেছে। একটু গোছানো হয়ে যাক তারপর তোর পিসীকে নিয়ে একদিন আসব। নানানানানা, চা-টা কিছু নয়, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই, নানা জায়গায় ঘুরতে হবে। আজ চললুম। ঝড়ের মতন এলুম আর গেলুম, তাই না? কিছু মনে করো না তোমরা, সুবিধে মতন আবার একদিন আসব।

পারুলবালাকে প্রশ্ন করে লোকনাথ জানলেন, মোহিতবাবু তাঁর আসল পিসে নয়, পিসের ভাই। ছেলেবেলায় তাঁর বাপের বাড়িতে আসল পিসের সঙ্গে তাঁর এই ভাইও মাঝে মাঝে আসতেন, সেই সূত্রে পরিচয়। তারপর কালে ভদ্রে তাঁর দেখা পাওয়া যেত। মোহিতবাবু নানা রকম কারবার ফেঁদেছিলেন। কোনওটারই এখন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেজন্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মনে হয় না। তাঁর অবস্থা ভালই, বড় বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। এখন তিনি কি করেন জানা নেই।

লোকনাথ তাঁর অফিসঘরে বসে ভাবতে লাগলেন। মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। মোহিতবাবুর স্নেহ হঠাৎ উথলে উঠল কেন? বহুকাল আগে লোকনাথ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এই কৃত্রিম পিসেমশাইটিকে দেখে থাকবেন, কিন্তু এখন মনে পড়ে না। আপাতত মোহিতবাবুর কোনও দোষও ধরা যায় না, তিনি বহুমূল্য উপহার দিয়েছেন কিন্তু কিছুই চান নি। হয়তো দিন-দুই পরেই একটা অন্যায় অনুরোধ করে বসবেন।

লোকনাথ তাঁর পত্নীকে বললেন, দেখ, তোমার পিসেমশাই-এর জিনিসগুলো এখন তুলে রাখ, হয়তো ফেরত দিতে হবে। ওই সব দামী দামী উপহারের জন্যে অস্বস্তি বোধ করছি, তাঁর মতলব বুঝতে পারছি না।

পারুলবালা বললেন, মতলব আবার কি, আমাদের ভালবাসেন তাই দিয়েছেন।

—উনি তোমার আপন আত্মীয় নন, ওঁর নিজের ছেলেমেয়েও আছে, তবে হঠাৎ আমাদের ওপর এত স্নেহ হল কেন?

—খুঁত ধরা তোমার স্বভাব। থাকলই বা নিজের ছেলেমেয়ে, পরের ওপর কি টান হতে নেই? পিসেমশাই বড়লোক, উঁচু নজর, তিনি দামী জিনিস উপহার দেবেন তাতে ভাববার কি আছে? তোমাকে তো ঘুষ দেন নি।

—যাই হক, তুমি এখন ওগুলো ব্যবহার ক'রো না।

পারুলবালা গরম হয়ে বললেন, কেন করব না? এমন জিনিস তুমি কোনও দিন আমাকে দিয়েছ, না তুমি তার কদর জান? পিসেমশাই যদি ভালবেসে দিয়ে থাকেন, তবে তুমি বাদ সাধবে কেন? আর, দামী জিনিস তোমাকে তো দেন নি, আমাকে দিয়েছেন। তুমি যে কাঠের র‍্যাকটা পেয়েছ সেটা না হয় ফেরত দিও।

লোকনাথ চুপ করে গেলেন।

দুদিন পরে মোহিতবাবু আবার এলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী আসেন নি, একজন অচেনা ভদ্রলোক এসেছেন।

মোহিতবাবু বললেন, বাড়ির সব ভাল তো লোকনাথ? ইনি হচ্ছেন শ্রীগিরধারীলাল পাচাড়ী, মস্ত কারবারী লোক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ইনি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

লোকনাথ ভাবলেন, এইবারে পিসের গোপন কথাটি প্রকাশ পাবে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রস্তাব?

—আচ্ছা বাবাজী, তোমার সার্ভিস শেষ হতে আর কত দেরি?

—এখন এক্সটেনশনে আছি, ছ মাস পরেই শেষ হবে।

—তার পর কি করবে স্থির করেছ?

—কিছুই করব না, লেখাপড়া নিয়ে থাকব।

হাত নেড়ে মোহিতবাবু বললেন, নানানানানা, বসে থাকা ঠিক নয়। তোমার শরীর ভালই আছে, মোটেই বুড়ো হও নি, তবে রোজগার করবে না কেন? শাস্ত্রে বলে, অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। তুমি হচ্ছ প্রাজ্ঞ লোক, অর্থ উপার্জনের সঙ্গেই বিদ্যাচর্চা করবে। যা বলছি বেশ করে বিবেচনা করে দেখ বাবাজী।

মোহিতবাবু তাঁর মাথাটি এগিয়ে দিয়ে বিশ্বস্তভাবে নিম্নকণ্ঠে বললেন, এই গিরধারীলাল পাচাড়ীজী হচ্ছেন সিকিম স্টেটের মস্ত বড় কনট্রাক্টার। পশম কম্বল কাঠ মৃগনাভি বড়-এলাচ চিরেতা মাখন ঘি এই সব জিনিস ওখান থেকে এদিকে চালান দেন, আবার সুতী কাপড় চাল গম তেল চিনি নুন কেরোসিন প্রভৃতি ওখানে সাপ্লাই করেন। সিকিমের আমদানি রপ্তানি এঁরই হাতে, মহারাজও এঁকে খুব খাতির করেন, নানা বিষয়ে

পরামর্শ নেন। মহারাজ এঁকে বলেছেন,—বলুন না গিরধারীবাবু, নিজেই বলুন না।

গিরধারী বললেন, শুনুন হুজুর। মহারাজ তার বড় আদালতের জন্যে একজন চীফ জজ চান। ওখানকার লোকদের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই, মনে করেন সবাই ঘুষখোর। ভাল লোকের খোঁজ নেবার ভার আমাকেই দিয়েছেন, তাই আমি মোহিতবাবুকে ধরেছিলাম। এঁর কাছে শুনেছি আপনিই উপযুক্ত লোক, যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান তেমনি ইমানদার সাধুপুরুষ।

লোকনাথ বললেন, জজের দরকার থাকে তো সিকিম সরকার ভারত সরকারকে লিখলেন না কেন?

মোহিতবাবু বললেন, লিখবেন লিখবেন। মহারাজ নিজে লোক স্থির করবেন তার পর ইণ্ডিয়া গভরমেণ্টকে লিখবেন, অমুককে আমার পছন্দ, তাঁকেই পাঠানো হক। কোনও বাজে লোক দিল্লি থেকে আসে তা তিনি চান না। খুব ভাল পোস্ট, দশ বছরের জন্যে পাকা। এখানকার হাইকোর্ট জজের চাইতে বেশী মাইনে, চমৎকার ফ্রী কোআর্টার্স, ফ্রী মোটরকার, আরও নানা সুবিধে। তুমি যদি রাজী হও তবে গিরধারীজী নিজে গিয়ে মহারাজকে বলবেন।

লোকনাথ বললেন, আমি না ভেবে বলতে পারি না।

—ঠিক কথা, ভাববে বইকি। বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, পারুলের সঙ্গেও পরামর্শ কর, অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু বেশী দেরি ক'রো না, মহারাজ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সেট্‌ল করতে চান, ইনি আবার চায়না জাপান বেড়াতে যাবেন কিনা। দিন কতক পরে আবার দেখা করব।

লোকনাথের অস্বস্তি বেড়ে উঠল, তিনি আবার ভাবতে লাগলেন। এই পিসেমশাইটি অদ্ভুত লোক, কেবল অনুগ্রহই করছেন, এখন পর্যন্ত প্রতিদান কিছুই চাইলেন না। দেখা যাক, আবার যেদিন আসবেন সেদিন তাঁর ঝুলি থেকে বেরাল বার হয় কিনা।

দু সপ্তাহ পরে মোহিতবাবু একাই এলেন। এসেই ম্লান মুখে বললেন, গিরধারীলালজী আসতে পারলেন না, তাঁর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।

—কি হয়েছে?

আর বল কেন, ভদ্রলোক মহা ফেসাদে পড়েছেন। তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে, রামশরণ পোদ্দারের ছেলে শিবশরণের সঙ্গে। কিন্তু শিবশরণের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এখন বেলে খালাস আছে। ছোকরা এদিকে ভালই, তবে বড়লোকের ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে

একটু চরিত্রদোষ ঘটেছিল। ব্যাপারটা কাগজে পড়ে থাকবে, প্রায় আট মাস আগেকার ঘটনা। তবলাওয়ালা লেনে তিতলীবাঈ নাচওআলী থাকত, তার কাছে শিবশরণ যেত, তার দুচারজন বন্ধুও যেত। দুপুর রাতে তিতলী যখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল তখন কোনও লোক তার পিঠে ছোরা মেরে পালিয়ে যায়। তিতলী বেঁচে আছে, কিন্তু খুবই জখম হয়েছে। পুলিস শিবশরণকেই সন্দেহ করে চালান দেয়। আমাদের সকলেরই আশা ছিল যে শিবশরণ খালাস পাবে, কিন্তু সম্প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দায়রা সোপর্দ করেছেন। ভাবী জামাই-এর এই বিপদে গিরধারীলাল পাচাড়ী অত্যন্ত দমে গেছেন, তাঁর মেয়েও কান্নাকাটি করছে। তবে আমি বেশ ভালই জানি যে ছোকরা একবারে নির্দোষ, তার কোনও বন্ধুই এই কাজ করে সরে পড়েছে।

লোকনাথের মুখ লাল হল। বললেন, দেখুন, এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোনও কথা বলবেন না। সেসনুসে আমার কোর্টেই কেসটা আসবে।

প্রকাণ্ড জিব কেটে মোহিতবাবু বললেন, অ্যাঁ, তাই নাকি নানানানানা, তাহলে তোমাকে আর কিছুই বলা চলবে না। তবে গিরধারীর জন্যে আমারও মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা, মকদ্দমাটা ভালয় ভালয় চুকে যাক, শিবশরণ খালাস পেলেই গিরধারীবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে সিকিম রওনা হবেন। বসো বাবাজী, চললুম।

পাঁচ দিন পরে লোকনাথ তাঁর অফিস ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ গিরধারীলাল পাচাড়ী স্মিতমুখে এসে বললেন, নমস্কার হুজুর।

লোকনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন পাচাড়ীজী, সেদিন মোহিতবাবুর কাছে যা শুনেছি তারপর আপনার সঙ্গে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না। আপনি এখন যান।

গিরধারীলাল হাত নেড়ে বললেন, আরে রাম রাম, সেসব কথা আপনি একদম ভুলে যান। রামশরণ আমার কেউ নয়, তার বেটা শিবশরণও কেউ নয়। সে খালাস পাবে কি না পাবে, তাতে আমার কি।

—কেন, সে তো আপনার ভাবী জামাই।

—থুঃ। আমার বেটী বলেছে, ওই লুচ্চা খুনী আসামীকে সে কিছুতেই বিয়া করবে না। এখন হুজুর যদি তাকে ফাঁসিতে লটকে দেন তাতে আমার কোনও ওজর নেই।

লোকনাথ বললেন, ওই কেস আমার কোর্টে আসবে না, অন্য জজের এজলাসে যাবে। আপনাদের প্রস্তাবের পর আমি আর এই মামলার বিচার করতে পারি না।

—বড় আফসোসের কথা। বদমাশটাকে হুজুর যদি কড়া সাজা

দিতেন তো বড় ভাল হত। আচ্ছা, ভগবান সব কুছ মঙ্গলের জন্যেই করেন। তবে আমার বড়ই নুকসান হল, শিউশরণকে সোনার ঘড়ি, হীরা বসানো কোটের বোতাম, আঙটি এই সব দিয়েছিলাম, তা আর ফেরত দেবে না বলেছে। হুজুর যদি ওকে দশ বছর কয়েদ দিতেন তো ঠিক সাজা হত। ওই মোহিতবাবুর মারফত আরও কিছু খরচ হয়ে গেল।

—আমাকে যে সব উপহার দিয়েছিলেন তারই জন্যে তো?

—হেঁ হেঁ, যেতে দিন, যেতে দিন।

—বলুন না, আপনার কত খরচ পড়েছিল?

গিরধারীলাল তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, দুটো শাল এগার শ টাকা, তাফতা দেড় শ টাকা, কিতাবদান পঁয়তাল্লিশ টাকা, মেওয়া ছত্রিশ টাকা, ট্যাক্সি ওগয়রহ ষোল টাকা, মোট তেরো শ সাতচল্লিশ টাকা।

আশ্চর্য হয়ে লোকনাথ বললেন, শাল তো একখানা ছিল।

—বলেন কি! একটা আপনার আর একটা শ্রীমতীজীর জন্যে কিনবার কথা। ওই শালা মোহিতবাবু একটা শালের দাম চুরি করেছে। দেখে নেবেন, আমি ওর গলায় পা দিয়ে সাড়ে-পাঁচ শ টাকা আদায় করে নেব। আমার সঙ্গে বেইমানি চলবে না, জরুর আদায় করব।

—তা করবেন। বাকী সাত শ সাতানব্বই টাকার একটা চেক আমি আপনাকে দিচ্ছি, আমার জন্যে আপনার লোকসান হবে না। একটা রসিদ লিখে দিন!

গিরধারীলাল যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ও হোহোহো, হুজুর একদম সাচ্চা সাধু মহাৎমা আছেন, খুদ ভগবান আছেন, আপনার দয়া ভুলব না।

—সিকিমের চাকরিটাও চাই না।

গিরধারীলাল পাচাড়ী সলজ্জ প্রসন্ন মুখে দন্তবিকাশ করে বললেন, হেঁহেঁহেঁ।

চেক নিয়ে পাচাড়ীজী প্রস্থান করলেন। লোকনাথের গ্লানি দূর হল, তিনি সোৎসাহে উৎকোচ তত্ত্ব রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

বামা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার যখন বাইশ বছর বয়স—তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেলো অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব-ওষুধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরী, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হতো সাধু ও সাত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিলো ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানো কাপড় পরনে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকতো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকতো।

বছর-তিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইলো না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর নামে এক গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রয়ের জন্য নয়; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজ মহাশয়ের শ্বশুরবাড়ি। সেখানে জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা সম্ভব আদায় করে আনতে।

কিন্তু তা হলেও পরনে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিলো, যদি পথে-ঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো পাবো!

কখনও ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটাঁচি তো হেঁটেই চলেছি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোটো বাজার পড়লো, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ রোজগারও করা গেলো, দেরিও হলো বিশেষ করে সেইজন্যে। আর একটা বাজার পড়লো। পথে সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে অন্ততঃ রাত ন'টা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, 'সন্ধ্যের পর গিয়ে আগে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এই সব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড়ো ভয়, বিদেশী দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে

বড়ো-বড়ো মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে ওরা। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ-তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়…'

বড়ো-বড়ো মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ-ঘেরা দীঘি দেখা গেলো বটে। আমার বুক ঢিপঢিপ করে উঠলো। দীঘির ও-পাশে সঞ্জয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্য আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিলো। কিন্তু সন্ধ্যে তো হয়ে গেলো তালদীঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নেই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কি ?

মনে ভারী ভয় হলো। কি করি এখন ? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলুম, কিছু না পারি, দৌড়োতে তো পারবো। না হয় ব্যাগটাই যাবে—প্রাণতো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম—খুব বড় সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দু'ধারে বড়ো বড়ো তালগাছের সারি, তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করছিলুম সে সবই ভুয়ো। মানুষ যে কেন এ-রকম মিথ্যে ভয় দেখায় !

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমনি তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেছি, সামনে দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম জিজ্ করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্জয়পুর। বাঁচা গেলো বাবা ! কি ভয়টাই দেখিয়েছিলো লোকে ! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু-বাছুর চরছে মাঠে—কেন এ-সব জায়গায় বিপদ থাকবে ?

আমি এই রকম সব ভাবছি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোটো একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, 'ঠাকুরমশায়, কোথায় যাবেন ?'

—'যাবো মাখমপুর।'

—'মাখমপুর ! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ…কাদের বাড়ি যাবেন ?'

—'শচীশ কবিরাজের বাড়ি।'

—'ঠাকুরমশাই কি কবিরাজমহাশয়ের গোমস্তা ?'

—'গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।'

—'এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন কি ?…মশায়ের নিজের বাড়ি কোথায় ?'

—'আমি তো এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও না। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি।'

—'সেখানেও কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না ?'

—'নাঃ, কে আর চিনবে ?'

আমার এই কথায় মনে হলো যেন বুড়ো কি একটু ভাবলে, তারপর আমায় বললে, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবান্না করে খাবেন, আসুন দয়া করে।'

সন্তুষ্ট হলুম। সত্যই সেকালের লোকেরা অন্য ধরনের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এ প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো-পথে সুমুখ-আঁধার রাতে যেতেই তো হতো মাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড়ো মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চন্ডীমন্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগলো না; এর আমি কোনো কারণ বলতে পারবো না, কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারের যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গল-সন্ধ্যায় কোনো গৃহস্থবাড়িতে আসিনি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হলো, বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটে বড়ো-বড়ো ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি-বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড়ো-বড়ো আটচালা ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠুরি।

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠুরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডী-মণ্ডপের পেছনদিকের সঙ্গে সংলগ্ন; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চুকে একা ভেতর-বাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হলো এই কুঠুরিতে। কুঠুরির একপাশে ছোটো একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, 'ঠাকুরমশায়, রান্না চাপান, আর রাত করছেন কেন?'

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, বাড়ির একটি বৌ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকে ঝাঁট দিতে লাগলো।

কুঠুরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে, সেখান থেকে কুঠুরির ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে

দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু-তিনবার বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে মনে হলো, বৌটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়! কি হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাবো রে, বাবা! কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করবো নাকি!

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেলো। কিন্তু বোধ হয় মিনিট-পাঁচেক পরেই আবার এলো। দেখে মনে হলো, সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কুঠুরির মধ্যে ঢুকে এটা-ওটা সরাতে লাগলো এবং আমার দিকে চাইতে লাগলো, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চাতক-দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে সরে এলো এবং নীচু-স্বরে বললে, 'ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে'—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেলো।

শুনে তো আমি আর নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইলো, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। বলে কি! দিব্যি গেরস্ত বাড়ি, গোলাগালা, ঘরদোর—ডাকাত কি রকম?

কিন্তু পালাবোই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকদের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো ওরা সন্দেহ করবে।

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে-পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট-পাঁচেক এমনিভাবে কাটলো—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটি আবার কি-একটা কাজে কুঠুরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মেয়েটি কথা বলবার আগেই আমি বললুম, 'তুমি যেই হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও, কোন্ পথে কিভাবে পালাবো...'

বৌটি চাপা গলায় বললে, 'সেইজন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেচে...'

আমি বললুম, 'তবে উপায়!'

মেয়েটি বললে, 'একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেচি। আমি এ-বাড়িতে আর ব্রহ্মহত্যা হতে দেবো না—অনেক সহ্য করেচি, আর করবো না দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।'

আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌটি আবার এলো, চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে বললে, 'শুনুন উপায়—এই কথা ক'টা মনে রাখুন। যদি মনে রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারবো আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ির মেজো-

বৌ, আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর-তেওটা, বর্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যেঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই।'

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কি হবে? বৌটি কিন্তু এক-একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দেয়, 'মনে আছে তো সব! জ্যাঠামশায়ের নাম কি?'

আমি বললুম, 'হরিদাস মজুমদার…'

—'না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার… আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ি কোন্ গাঁয়ে?…'

—'ক্ষান্তমণি। শ্বশুরবাড়ি হলো—শ্বশুরবাড়ি হলো—শ্বশুরবাড়ি…'

—'আপনি মাটি করবেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন…'

—'সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু—দুর্লভরাম দাস—'

অবশেষে মিনিট-দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

বৌটি বললে, 'রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোনো ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি। এখন শুনুন, খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিজ্ঞেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনো রকম সন্দেহ যেন না হয়…আমি চললুম, আবার আসবো আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা তো যায় না!…

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হলো। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসেছি, আর আমার মনে হচ্ছে, এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে আমার গলা কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এলো। বললে, কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হলো? এখন দিব্যি আরামে শুয়ে পড়ুন। মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েছে, আর দেরি করবেন না…'

আমি বললুম, হ্যাঁ, একটা কথা বলি…আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এ দিকেই কোথায় বিয়ে হয়েছে। তারাও

জাতে তোমাদেরই বারুই কি না—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিলো মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে, তা যখন এলুমই এ দেশে—'

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেলো, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?···আপনি তাদের চিনলেন কি করে?'

বামার কথা স্মরণ করে গলা না-কাঁপিয়ে আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা।'

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, 'বসুন, আমি আসচি···'

আমি একটা কুঠুরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও যায়নি। আর এরা যে গুরুদেবকেও রেহাই দেবে তা কে বলেছে?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এলো; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্কা গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সম্ভবতঃ বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, 'এই যে বামা ঠাকুরমশায়। আমারই মেজো ছেলের সঙ্গে ···এই আমার মেজো ছেলে শম্ভু···গড় করো সব, গড় করো···মেজো বৌমা, দেখো তো, চিনতে পারো এঁকে?

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেলো সে!

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়লো।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেলো। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেলো। বললে, 'বিপদ কেটে গেছে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হতো, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হতো। অনেক হয়েছে –এই কুঠুরিতে, এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা।'

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, 'পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না, কিছু বলে না?'

—'কে কি বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এ-রকম। আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেলো আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েছেন—পুরানো ডাকাত, দাদা রয়েছে··· আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর কোনো ভয় নেই···'

সকাল হলো। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা

গুরুপ্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, 'তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি, চিরসুখী হও মা…'

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়েনি। কতকাল হয়ে গেলো, এই বৃদ্ধ বয়েসও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে!

বেড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীর ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া! খুব লম্বা মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাতখানেক উঁচু হবে। বেড়া ডিঙিয়ে কারো নজর চলবে না, অবশ্য যদি উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নজর চালানো না হয়। নজর দেবার অন্য উপায় আছে: ফুটোতে চোখ পাতা।

বাড়ীটাকে সমান দু'ভাগ করেছে বেড়াটা, পশ্চিমের ভিটার লম্বা দাওয়া ভাগ ক'রে, উঠান ভাগ ক'রে সদরের বেড়ার চার হাত ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ে খানিক এগিয়ে বাড়ীতে ঢুকবার এই ফাঁক আড়াল ক'রতে দাঁড় করানো সামনের পর্দা-বেড়াটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঠেকেছে।

আগে, প্রায় সাত বছর আগে, গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দনের বাপ অনন্ত হাতী যখন বেঁচে ছিল, তখন বাড়ীতে ঢুকবার পথ ছিল একটা দক্ষিণ-পূব কোণে। এই পথের সামনেও বসানো ছিল একটা আড়াল-করা পর্দা-বেড়া। ভাগের সময় পথটা পড়েছিল জনার্দ্দনের ভাগে। সদরের বেড়ার আরেক প্রান্তে, অর্থাৎ উত্তর-পূব কোণে বেড়া কেটে নতুন একটা প্রবেশ-পথ করে নিতে অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় গোল বেধেছিল। ঢুকবার-বেরোবার পথই যদি না থাকল, বাড়ীর এমন ভাগ দিয়ে সে কী করবে—গোবর্দ্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মালিকদের মানতে হ'য়েছিল যে তার আপত্তি সঙ্গত। অনেক মাথা ঘামিয়ে তারপর সালিশরা, যাদের প্রধান ছিলেন সদরের সেরেস্তাদারের বাবা প্রাণধন চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্যাভূষণ, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ভাগের বেড়ার দু'পাশে সদর বেড়া দু'হাত ক'রে কেটে দুই অংশের ঢুকবার-বেরোবার পথ করা হোক, আর পুরনো পর্দা-বেড়া তুলে এনে স্থাপন করা হোক এই বিভক্ত পথের সামনে; কারণ ও-বেড়াটাও দু'ভায়ের বাপের সম্পত্তি। অতএব দু'জনের ওতে সমান অধিকার।

জনার্দ্দন আপত্তি ক'রে বলেছিল আড়াল-করা বেড়া সরালে সদর বেড়ার কোণের পুরনো পথের ফাঁকে রাস্তার লোক যে তার বাড়ীর বৌ-ঝিদের দেখতে পাবে, তার কী হবে ? সে এমন কী অপরাধ ক'রেছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে তাকে বন্ধ ক'রতে হবে বেড়ার ফাঁক ! রীতিমত সমস্যার কথা। সালিশরা যখন মীমাংসা খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছেন, গোবর্দ্ধন উদার ও উদাসভাবে বলেছিল, তিন হাত বেড়ার ফাঁক-বন্ধ করার পয়সা খরচ করতে যদি জনার্দ্দনের আপত্তি থাকে, সে এদিকের অংশ নিক। সদর বেড়ার ফাঁকের অসুবিধা ভোগ করতে গোবর্দ্ধন রাজী আছে।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সালিশরা হঠাৎ সমস্যাটার চমৎকার মীমাংসা আবিষ্কার করেন। কেন, দু'পাশে দু'হাত করে পথ করতে সদর বেড়ার মাঝখানে চার হাত অংশ তো কাটতেই হবে, তাই দিয়ে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে জনার্দ্দনের অংশের সদর বেড়ার পুরনো ফাঁক !

এমনি দুর্য্যোধনী জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হ'য়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর। অনন্ত হাতীর শ্রাদ্ধের দশ দিন পরে বেড়াটা উঠেছিল। আদালত কুরুক্ষেত্রে তারপর যত লড়াই হ'য়ে গেছে দু'ভায়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে, যত হাতাহাতি গালাগালি হ'য়ে গেছে বাগানের ফল, পুকুরের ঘাট, গাছের মরা ডালের ভাগ নিয়ে তারও যেন প্রতীক হ'য়ে আছে এই বেড়াটিই। জীর্ণ হ'য়ে এসেছে বেড়াটা, এখানে ওখানে মেরামত হ'য়েছে, আর এখানে পড়েছে মাটির চাবড়া, ওখানে গোঁজা হ'য়েছে ন্যাকড়া, সেখানে সাঁটা হ'য়েছে কাগজ।

বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে উঁকি মারা চলত—দু'পাশ থেকেই। হঠাৎ গোবরগোলা জল বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ত গায়ে। গোবর্দ্ধনের মেয়ে পরীবালা একদিন চোখ পেতে আছে বেড়ার ফুটোয়, জনার্দ্দনের মেয়ে তাকে তাকে থেকে একটা কঞ্চি সেই ফুটো দিয়ে চালান ক'রে দিল তার চোখের মধ্যে। চোখ যায় যায় হল পরীবালার, মাথা ফাটে ফাটে হল গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'ভায়ের, ক'দিন পাড়ায় কাণ পাতা গেল না দু'বাড়ির মেয়েদের গলাবাজীতে। বেড়ায় কাঁথা-কাপড় শুকতে দিলে অদৃশ্য হ'য়ে যেত। এঁটো-কাঁটা, নোংরা, ছেলেমেয়ের মল বেড়া ডিঙিয়ে পড়ত একপাশ থেকে অন্যপাশে। এ পাশের পুঁই বেড়া বেয়ে উঠে ও পাশের আয়ত্তে একটি ডগা একটু বাড়ালেই টেনে যতটা পারা যায় ছিঁড়ে নেওয়া হত। বেড়া ডিঙিয়ে অহরহ আসা-যাওয়া করত সমালোচনা, মন্তব্য, গালাগালি, অভিশাপ। চেরা বাঁশের বেড়াটাকে মাঝে রেখে এমন একটানা শত্রুতা চলত দু'পাশের দু'টি পরিবারের মধ্যে যে, সময় সময় মনে হত কবে বুঝি ওপাশের চালা পুড়িয়ে দেবার ঝোঁক সামলাতে না পেরে এপাশে নিজের চালাতেই আগুন ধরিয়ে দেয় !

গোলমাল এখনো চলে, বিদ্বেষ এখনো বজায় আছে পুরো মাত্রায়।

তবে গোড়ার দিকের মতো খুটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অহরহ হাঙ্গামা চলে না, গায়ে পড়ে সহজে কেউ ঝগড়া বাধায় না। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে দু'পাশের মানুষগুলি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে সংযম অভ্যাস ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। আক্রমণাত্মক হিংসা কমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলাত্মক মনোভাবে। খোঁচাবার ও গায়ের ঝাল ঝাড়বার প্রক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বেশ কৌশলময় ও মার্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে। এপাশের ছেলেমানুষ কানাই মাঝের বেড়ার মাহাত্ম্য ভুলে ও-পাশে সমবয়সী বলাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে, শত্রুপক্ষের ছেলেকে আয়ত্তে পেয়েও ও-পাশের কেউ তাকে ধরে পিটিয়ে দেয় না, আচ্ছা ক'রে মার দেওয়া হয় বলাইকে। এ-পাশ থেকে হাক ওঠে, কানাই! কানাই এলে তাকে চড়চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করা হয়, ও-বাড়ী মরতে গেছিলি কেনরে, বেহায়া পাজী বজ্জাত? ও-পাশ থেকে জবাব আসে বলাই-এর প্রতি আরও জোর গলায় শাসানোতে, ফের যদি ও বাড়ীর কারো সাথে তুই খেলিস হারামজাদা নচ্ছার···

দু'পাশেই ছেলেমেয়ে আছে, হাজার বলে তাদের বোঝানও যায় না যে, বেড়ার ও-পাশ যেতে নেই। ছেলেমেয়েরা তাই নিরাপদ থাকে। তবে কুকুর বেড়ালের রেহাই নেই। এপাশের বেড়াল ও-পাশে হাঁড়ি খেতে গেলে তার রক্ষা থাকে না।

দু'পাশের হাঁড়িই যখন প্রায় শূন্য থাকছে দুর্ভিক্ষের দিনে, জনার্দ্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের বৌ রাণীবালার পোষা বিড়ালটা মেউ মেউ ক'রে বেড়াচ্ছে খিদেয় কাতর হ'য়ে, গোবর্দ্ধন একদিন কোথা থেকে যোগাড় ক'রে নিয়ে এল আধসেরি একটা রুইমাছ। মাছ দেখে খুসী হ'য়ে হাসি ফুটল সবার মুখে, দু'মুঠো চাল সেদিন বেশী নেওয়া হল এই উপলক্ষে। গোবর্দ্ধনের ছেলে সূর্য্যকান্তের বৌ লক্ষ্মীরাণী আঁশবঁটি পেতে কুটতে বসল মাছ।

মাছ কাটা শেষ হ'য়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য্যকান্ত বৌয়ের দিকে গোড়ায় যেমন তাকাত প্রায় সেই রকম সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাছের দিকে, কোথা থেকে রাণীবালার আদুরে বিড়াল এসে এক টুকরো মাছ মুখে তুলে নিল। মাছকাটা বঁটিটা তুলেই সূর্য্যকান্ত বসিয়ে দিল এক কোপ। রাণীবালার আদুরে বিড়াল একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত না ক'রে মরে গেল। মাছের টুকরোটা মুখ থেকে খসে পড়ায় লক্ষ্মীরাণী সেটা তুলে রাখল চুপড়িতে।

পথের ধার থেকে মরা বিড়ালটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল চণ্ডী বসাক। চাল ছিল না কিন্তু ঘরে তার একটু নুণ আর একটু হলুদ-লঙ্কা ছিল। ঘুরে ঘুরে হত্যা দিয়ে দুটি খুদকুঁড়ো চণ্ডী যোগাড় ক'রে নিয়ে এল। ঝাল ঝাল বিড়ালের মাংস দিয়ে সে-দিন সে দু'বেলা ভোজ খেল সপরিবারে।

হত্যাকাণ্ডের খবরটা রাণীবালা পেল পাঁচুর মার কাছে। ও-বাড়িতে পাঁচুর মা দু'টি চালের জন্য গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধন্না দিয়ে থেকেও শেষ পর্য্যন্ত পায়নি। নিজের চোখে সে ঘটনাটা দেখেছে আগাগোড়া। এ কি কাণ্ড মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, হিংসে করে মা-ষষ্ঠীর বাহনকে মারলি একাদশীর দিন, এত শত্রুতা ?

'দু'টি চাল দিবি বৌ ? দে মা, দু'টি চাল ? বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুঁড়ো যা'হোক দুটি দে।'

'কোথা পাব গো ? চাল বাড়ন্ত। খুদকুঁড়ো শাউড়ী আগলে আছে।'

বলে বিড়ালের শোকে রাণীবালা কাঁদতে থাকে, বাড়ীর সকলের কাছে নালিশ জানায়। সামলাতে না পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, অভিশাপও দিয়ে বসে ও-পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রাণীবালা বিড়াল পুষতে ভালবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে। ও-বাড়ীর লোক হত্যা না ক'রলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।

কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে জনার্দ্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ চুপ কর বাছা। বাড়াবাড়ি কোরো না।'

চন্দ্রকান্তও প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি করে খেতে ?'

রাণীবালা হকচকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কি। রাগে অভিমানে তার গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারো পেট কলমীশাক-সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে ভরে না। কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা ক'রে শুয়ে থাকলেও !

চন্দ্রকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়—পুলপারের জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'জনে মিলে না বেচলে জমিটা বেচবারও উপায় নেই। কাল দু'জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রছে প্রাণধন চক্রবর্ত্তীকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোন কারণে গোবর্দ্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুস্কিল হবে।

'ঝগড়াঝাটি কোরো না খবর্দ্দার, ক'দিন মুখ বুজে থাকো।'

বিড়াল মারার সময় গোবর্দ্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সে-ও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্য্যকে বলে, 'একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের ? এমনি করে ক্যাকড়া বাধাও, ব্যাস, জমি বেচাও খতম। খেয়ো তখন কচুপোড়া সিদ্ধ ক'রে। খবর্দ্দার, কেউ ঝগড়া করবে না ওদের সাথে। মুখ বুজে থাকো ক'দিন।'

সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু'পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপি চুপি, চাপা গলায়, নিজেদের মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজা-সুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্যই এপার চেঁচালো, 'ও কানাই, ওদের বেগুন ক্ষেতে গরু ঢুকেছেরে।' ওপারও চেঁচালো এপারকে শুনিয়ে, 'ও বলাই, ওদের পুঁটু পুকুরপাড়ে একলা গেছেরে।' আমতলায় কানাই বলাইকে খেলতে দেখে কোন পার কিছু বলল না। এপারের ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষ্মীরাণীর বিড়াল প্রায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপারের দাওয়ার কোণে জড়ো করা ছেঁড়া চটে। হাতটা মনটা বারবার নিসপিস করে উঠলেও রাণীবালা পর্য্যন্ত তাকে কিছু বললে না। ওপারের পুঁই গাছের সতেজ ডগাটি লক লক ক'রে বাতাসে দুলতে লাগলো এপারের এলাকায়!

কথা যা বলাবলি হল তিন দিনে দুপারের মধ্যে, তা শুধু গোবর্দ্ধন আর জনার্দ্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গম্ভীর নৈর্ব্যক্তিক কথা, তবু এভাবেও তো সাত বছর তারা কথা বলেনি।

দলিল রেজেস্ট্রী করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্দ্ধন বলে, 'কখন রওনা হবে, জনা?'

'এই খানিক বাদেই,' জবাব দিয়ে, একটু থেমে জনার্দ্দন যোগ দেয়, 'ফেলনার জ্বরটা বেড়েছে।'

ফেলনা রাণীবালার ছেলে।

একসাথে বেরোয় দু'জনে, জনার্দ্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গোবর্দ্ধনকে। একসাথে বাড়ী থেকে বেরোবার কোন দরকার অবশ্য ছিল না। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হ'য়ে তারা সাব রেজেস্ট্রারের অফিসে রওনা হবে, একে একে গিয়ে সেখানে জুটলেও চলতো। কিন্তু সাত বছর বিবাদ ক'রে আর দাঁতমুখ খিচিয়ে কাটাবার পর দু'ভাই যখন শান্ত ভাবে ক'দিন ধরে কথা বলে, তখন কি আর দরকার আছে অত হিসেব করে সব কাজ করার! দু'জনে চলতে থাকে একরকম নির্ব্বাক হ'য়েই। মাঝে মাঝে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আড়চোখে। সাত বছরে দু'জনের বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে সংসারের চাপে, দুর্ভিক্ষের গত দু'বছরেই যেন বেশী বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও কি আছে ভগবান জানেন!

'দরটা স্থবিধা হল না।'

'উপায় কি?'

'ডবল দরে এমন জমি মিলবে না।'

'ঠিক। লতিফের সেচা জমির চেয়ে ভাল ফসল দিয়েছে গতবার।' গোবর্দ্ধন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে।—'শোন বলি, জনা। না বেচলে

হয় না জমিটা ? এক কাজ করি আয়। না বেচে বাঁধা রাখি, পারি তো ছাড়িয়ে নেব দু'জনে মিলে।'

'চক্কোত্তি মশায় কি রাজী হবে ?'

'রাজী না হয় তো মধুসা'র কাছে বাঁধা দেব। নয়তো রথতলায় নিকুঞ্জকে। বেচে দিলে তো গেল জন্মের মত। যদি রাখা যায় !'

গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন—অনন্ত হাতীর দুই ছেলে, কথাটা বিচার ও বিবেচনা ক'রে দেখতে থাকে। দেখে লোকের মনে হয় যেন আলাপ ক'রছে দু'টি সাঙ্গাৎ।

এদিকে জ্বর বাড়তে বাড়তে ফেলনার যায় যায় অবস্থা হয় দুপুর-বেলা। চাঁচের বেড়া থাকলেও ওপারে সব টের পায় সবাই। সূর্য্যের মা ইতস্তত করে অনেকক্ষণ ফিস ফিস ক'রে সূর্য্য আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে কয়েকবার, 'যাব নাকি ?' তারপর বেলা পড়ে এলে সতীরাণীর বিনুনী কান্না শুনে হঠাৎ মনস্থির করে সাত বছর পরে সূর্য্যের মা বেড়ার ওপারে যায়, আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ফেলনার শিয়রে চাঁদের মার পাশে। সন্ধ্যার আগে ফেলনা মারা গেলে মড়া-কান্না শুনে এপারের বাকী সকলেও হাজির হয় ওপারে। সাত বছরে পাঁচবার মড়া-কান্না উঠেছে জনার্দ্দনের অংশে, কিন্তু গোবর্দ্ধনের অংশ থেকে বেড়া পেরিয়ে কেউ কখনও আসেনি। সাত বছর পরে আজ বেড়ার দু'দিকের মেয়েরা বেড়ার একদিকে হ'য়ে একসঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। চাঁদ শোকের নেশায় পাগলের মত কাণ্ড আরম্ভ করলে সূর্য্য তাকে ধরে রাখে। একটু রাত করে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন যখন বাড়ী ফেরে তখনও দেখা যায় ওপারের প্রায় সকলেই রয়েছে এপারে, ওপারের ছেলেমেয়েগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে এপারের মাদুরে কাঁথায়, এপারের ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে।

তাই বলে যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি বন্ধ হ'য়ে গেল দু'পারের মধ্যে চিরদিনের জন্য, উঠানের মাঝখানে পুরনো চাঁচের বেড়াটা থেকেও রইল না, তা নয়। মানুষ তা'হলে দেবতা হ'য়ে যেত। তবে পরের আশ্বিনের ঝড়ে পচা বেড়া পড়ে গেলে সেটা আবার দাঁড় করবার তাগিদ কোন পারেরই দেখা গেল না। বেড়াটা ভেঙ্গে জ্বালান হতে লাগলো দুপারেরই উনানে। দু'পারের ঝাঁটার সঙ্গেও সাফ হ'য়ে যেতে লাগলো বেড়ার টুকরো আবর্জ্জনা। শেষে একদিন দেখা গেল দাওয়ার বেড়াটি ছাড়া উঠানে বেড়ার চিহ্নও নেই, বাড়ীর মেয়েদের ঝাঁটায় দু'টির বদলে একটি উঠান তকতক ক'রছে।

বুড়ীটা

বনফুল

"একঠো পয়সা দে নি বাবু—"

এই তাহার ভিক্ষা চাহিবার ভাষা। আমার কাছে রোজ আসে। হাতে একটা শুকনো ডাল, তাহার সাহায্যেই পথ হাঁটে। ভিখারিনী বুড়ীকে কে আর লাঠি কিনিয়া দিবে। শুকনো গাছের ডালটা কোথাও বোধহয় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পরনের কাপড়খানি শতছিন্ন, বহুবার সেলাই-করা আর খুব পাতলা। একটু গোলাপী-রঙের আভা আছে। এককালে বোধহয় কোনও বিলাসিনীর দেহ শোভা-বর্ধন করিয়াছিল। বুড়ীর গায়ে কিন্তু অত্যন্ত বেমানান। বেচারার শীত পর্যন্ত নিবারিত হয় না।

আমার কাছে প্রায় রোজই আসে বুড়ী। আর আসিয়া একটি ওই প্রার্থনাই জানায়—"একঠো পয়সা দে নি বাবু—"। তাহাকে রোজ একটি করিয়া পয়সা দিই। মনে মনে তাহার একটা নামও রাখিয়াছি—পি. পি. —পার্মানেণ্ট পাওনাদার।

যখন আমার ক্লিনিকে লোকের ভিড় থাকে, তখন তাহাকে আসিবামাত্র একটা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিই। যখন কেহ থাকে না তখন মাঝে মাঝে তাহার সহিত আলাপ করি। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে ভিক্ষাবৃত্তি কেন অবলম্বন করিয়াছে। বলিল, "ছেলে বউ আর খাইতে দেয় না, আশ্রয় দেয় না, তাড়াইয়া দিয়াছে। যতদিন গতর খাটাইয়া রোজগার করিয়াছিলাম, খাইতে থাকিতে দিত। এখন আর দেয় না।" তাহার কম্পিত বাম হাতটি কপালে ঠেকাইয়া বলিয়াছিল—"সভই কপার ছে বাবু—।"

আর একদিন পয়সাটি দিবার পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আর কি চাস বুড়ী—"

উত্তর দিয়াছিল, "মরণ!"

এ রকম দার্শনিক উত্তর আশা করি নাই। তাহার জরা-বিধ্বস্ত মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম, দেখিলাম সত্যই একটা আর্ত আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার একদিন একা বসিয়া আছি। বুড়ী আসিয়া তাহার প্রাত্যহিক নিবেদনটি জানাইল। দেখিলাম, চোখ উঠিয়াছে। ভালো করিয়া চাহিতে পারিতেছে না। চোখের দুই কোণে পিঁচুটি। একটু ঔষধ দিয়া দিলাম।

"আঁখো মে কি ভেলে বুঢ়িয়া ?"

"ঠানঢা লাগি গেলছে বাবু। একঠো কাপড়া দে নি। বড়ি জাড়।"

"যঁহা কাপড় কাঁহা ছে, ঘরো পর যা, মিলতৈ।"

বুড়ী বলিল, সে আমার ঘর চেনে না, আমি যেন দয়া করিয়া একখানা কাপড় তাহার জন্য লইয়া আসি। প্রতিশ্রুতি দিলাম—আসিব। ভাবিলাম, ভালই হইবে, আমি মোটা খদ্দর পরি, শীতে বুড়ী একটু আরাম পাইবে। পরদিন বুড়ী যথারীতি আসিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম। খদ্দর আনিতে মনে ছিল না। পরদিনও ভুলিলাম, তাহার পরদিনও। নিজের বিস্মৃতির জন্য তৃতীয় দিন সত্যই অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তখন আমার মোটর ড্রাইভারকে বলিলাম সে যেন আমাকে মনে করাইয়া দেয়। সেও উপর্যুপরি ভুলিতে লাগিল। তৃতীয় দিনের পর বুড়ীটা আর কিন্তু কাপড়ের কথা বলে নাই। কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইলেই কাপড়ের কথাটা মনে পড়িত। অবশেষে ড্রাইভারের একদিন বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। গৃহিণীও বেশ মোটা একটি খদ্দরের কাপড় তাহার জন্য বাহির করিয়া দিলেন। ড্রাইভার সেটি আমার ক্লিনিকের একটা তাকে পাট করিয়া রাখিয়া দিল, বুড়ী আসিলেই তাহাকে দিবে।

বুড়ী কিন্তু আর আসিল না। সে যে আর আসিতেছে না ইহাও প্রথম দুই-তিন দিন লক্ষ্য করি নাই, কয়দিন রোগীর বেশ ভিড় ছিল। তাকের কোণে কাপড়টা দেখিয়া হঠাৎ একদিন মনে হইল, তাই তো বুড়ীটা তো আর আসিতেছে না।

আরও দিন কয়েক কাটিল, বুড়ী আসিল না। শেষে বুড়ীর কথা আর মনেও পড়িত না। ভিড়ের সময়ে মনে পড়িত না বটে, কিন্তু একা থাকিলে মাঝে মাঝে মনে হইত বুড়ীর কি হইল। কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকদিন একা থাকিবার সুযোগ পাইলাম না। নিজের কাজকর্ম তো ছিলই, তাহার উপর শহরে একটা চাঞ্চল্যও জাগিয়াছিল। সংবাদ রটিয়া গিয়াছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসিতেছেন, মাঠে বক্তৃতা দিবেন। চতুর্দিকে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল।

যেদিন পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা দেবার কথা, সেদিন আমাকে একটা দূরের গ্রামে কলে যাইতে হইয়াছিল। খুব ভোরে গিয়াছিলাম, যাহাতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি শুনিতে পারি। কিন্তু রোগী দেখিতে এবং তাহার পরিবারবর্গের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেশ একটু দেরি হইয়া গেল। আশঙ্কা হইতে লাগিল পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি বোধহয় আর শোনা হইল না। রোগীর বাড়ির লোকেরা বলিল, মাঠামাঠি একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, সেটা দিয়ে গেলে ঠিক সময়ে নাকি পৌঁছিতে পারিব। সে রাস্তাতে মোটরও চলিবে। সুতরাং সেই মাঠামাঠি রাস্তাই ধরিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটা শোনা হইল না। একটা গ্রামের কাছে ড্রাইভার সজোরে ব্রেক কষিয়া গাড়িটা থামাইয়া দিল। পথের উপরই একটা মড়া, তাহাকে ঘিরিয়া শকুনি আর কাক। তাহার চোখ-মুখ ছিঁড়িয়া খাইয়াছে, চেনা যায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গাছের শুকনো ডালটা পাশে পড়িয়া আছে। তখনই মনে হইল—এ তো সেই বুড়ীটা! গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। ড্রাইভার শকুনি তাড়াইতে লাগিল, আমি হাঁটিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। খোঁজ করিতে করিতে অবশেষে আমারই চেনা একজন লোক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মুখে শুনিলাম, শীতেই কাল রাত্রে বুড়ী মারা গিয়াছে। তাহার গায়ে একেবারে কাপড় ছিল না।

"বুড়ী কি এইখানেই থাকত?"

"না, আগে তো দেখিনি কখনও।"

আর একজন লোক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "বুড়ী দুই দিন আগে এই গ্রামে আসিয়াছিল। কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল তাহার ছেলে এই গ্রামে আছে। কিন্তু খবরটি ভুল। লাট্টুলাল বলিয়া কেহ এ গ্রামে নাই।" বলিলাম, "একটা মানুষকে শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তোমরা একটা ব্যবস্থা করতে পারনি?"

লোক দুইটি অপ্রতিভ হইল।

তাহার পর বলিল, "দাহ করতে অন্তত দশটা টাকা খরচ হবে। কে দেবে ডাক্তারবাবু টাকা। যা দুরবস্থা আমাদের আজকাল। অনেকের দুবেলা অন্নই জোটে না। কার কাছে চাঁদা চাইব বলুন—"

"বেশ, তোমরা ব্যবস্থা কর, আমিই টাকা দেব।"

কুড়িটা টাকা দিলাম। লোকটা বলিল, "এতে তো একদল কীর্তনীয়াও হয়ে যাবে। শালুও হবে।" তাহাই হইল। কীর্তন করিতে করিতে গ্রামের লোকেরা বুড়ীকে শালু ঢাকা দিয়া মহাসমারোহে গঙ্গার ধারে লইয়া গেল।

ফিরিয়া শুনিলাম বক্তৃতায় নেহেরুজী বলিয়াছেন, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তাঁহার গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ করিতেছেন। বক্তৃতা দিয়া বিমানযোগে পাটনা চলিয়া গিয়াছেন, সেখানে আর একটি বক্তৃতা দিবেন। তাহার পরদিন কাগজে তাঁহার বক্তৃতাটাই পড়িতেছিলাম।

"একঠো পয়সা দে নি বাবু—" চমকাইয়া দেখিলাম দ্বারপ্রান্তে সেই বুড়ীটা দাঁড়াইয়া আছে। হাতে সেই শুকনো ডালটা।

"কি বুঢ়িয়া আভিতক্ জিন্দী হ্যায়?"

"মরণ কাঁহা আবৈছে বাবু।"

"তোরা কাপড়া রাখলো ছে। লে যা। কাঁহা ছেলে এতনা দিন—"

"পয়ের মে কাঁট গড় গেলছেলো। থোড়া দাবাই দে নি—"

পায়ে পেরেক ফুটিয়াছিল তাই আসিতে পারে নাই। একটু টিঞ্চার আয়োডিন লাগাইয়া দিলাম। তাহার প্রাত্যহিক পাওনা পয়সাটিও দিলাম। বুড়ী ছেঁড়া খদ্দরটা গায়ে দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। অনুভব করিলাম সেদিন আমার ভুল হইয়াছিল। শুকনো-ডাল হাতে বুড়ী আমাদের দেশে অনেক আছে।

কুইন অ্যান

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উড্‌বার্ন সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতেছেন, আসবাবপত্র সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দুইটা কুকুর সঙ্গে যাইবে, গোটা চারেক বিলি হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে একটি ঘুড়ী। সাহেব ওটাকে প্রথম হইতেই ওয়েলার জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রবল খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ; যাহাদের কিনিবার ক্ষমতা আছে, বলিতেছে, আরেবিয়ান জাতের হইলে কেনা যাইত। দুই-একজন নন-খিলাফতিস্ট রাজী হইয়াছে, কিন্তু দর উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া সাহেবের কানে উঠিয়াছে, ইহারা নিজেরা ব্যবহার করিবে না, তিনি যাত্রা করিলেই জাত ভাঁড়াইয়া ঘুড়ীটাকে প্রাচ্য করিয়া লইবে, তাহার পর চড়া দামে ছাড়িয়া দিবে।

এদিকে সময় আর মাত্র দিন পনরো-ষোল; মীমাংসা একটা হওয়া চাইই। অথচ সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, ঘুড়ীটা যাহার তাহার হাতে পড়িয়া কষ্ট পায়, একাদিক্রমে দশটা বৎসর একসঙ্গে আদরযত্নে কাটাইল! কি যে করিবেন, ব্যাকুলভাবে চিন্তা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ রায় সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। রায় সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহার হাতের দেওয়া খেতাব, লোকটা খাতির রাখিলেও রাখিতে পারে। সাহেব ভাবিলেন, দেখাই যাক না ভেজে কি না; ঘুড়ীটা তাহা হইলে সুখে থাকে।

রায় সাহেবকে সেলাম পাঠানো হইল। উপস্থিত হইলে অবান্তর নানা রকম কথার পর আসল কথাটা পাড়িলেন। দেখা গেল, ভিজিয়া

থাকাটাই রায় সাহেবদের স্বাভাবিক অবস্থা, বেশি সিঞ্চিত করিতে হইল না। সাহেব যে অন্যের হাতে প্রিয় ঘড়ীটাকে বিশ্বাস করিয়া দিতে চান না, আর এতগুলো হোমরা-চোমরাদের মধ্যে তিনিই যে সাহেবের বিশ্বাসভাজন বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন, ইহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের যখন সেই রকমই অভিরুচি, তখন তিনি উপহার হিসাবেই সেটিকে লইতে রাজী আছেন, গৌরবের সহিত রাজী আছেন। তবে দাম হিসাবে নয়, শুধু বিলাতে গিয়া তিনি যাহাতে ওই রকমই একটি ঘড়ী অবিলম্বে কিনিয়া লন, সেজন্য অল্পস্বল্প করিয়া অন্ততপক্ষে হাজারখানেক টাকাও অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রায়-সাহেবোচিত বিনয়ের সহিত একটু তর্কও করিতে ছাড়িলেন না, তা যদি না করেন সাহেব, তো হুজুরের দান দেখে অধীন না হয় সর্ব্বদা হুজুরকে স্মরণ করবে, কিন্তু অধীনকে মনে করার হুজুরের কাছে থাকবে কি? না, সে হবে না।

উঠিবার সময় রায় সাহেবও আসল কথাটা পাড়িলেন, বার্থ-ডে অনার্সের সময়টা আসছে, হুজুর যাচ্ছেন, আশেপাশেই ক-বছরের মধ্যে পাঁচ-ছটা রায় সাহেব হয়ে গেল, ছ্যাকড়া-গাড়ির মত বেড়ে যাচ্ছে, ওতে আর মান থাকে না। লোকে গালাগাল দেওয়ার জন্যে আজকাল কথাটা ব্যবহার করছে।

সাহেব কথা দিলেন, আগন্তুক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ফর্দ্দ দিবার সময় তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন। উঠিবার সময় করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, আমার মস্ত বড় একটা সান্ত্বনা রইল যে, ঘড়ীটা একজন সমঝদার আর হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ারের হাতে পড়ল। শুনলাম, এ তল্লাটে নাকি এ বিষয়ে আপনার সমকক্ষ আর নেই কেউ।

রায় সাহেব নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, না তেমন কিছু নয়, তবে ঘোড়া জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে চড়ার অভ্যাস আছে, এই যা।

২

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তবে পনরো আনা বাড়াইয়া বলা। বয়স যখন চৌদ্দ কি পনরো হইবে, রায় সাহেব ফোটো তুলিবার জন্য সখ করিয়া একবার একটা টাট্টুতে চড়িয়াছিলেন, একটা মহারাষ্ট্রী ব্যবসাদার বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। চড়ার পরমুহূর্ত্তে হইতে ঘোড়াটা বনবন করিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে এ রকম ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে, প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘাড়ের চুল আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল; সবে নূতন পৈতা হইয়াছে, গায়ত্রীর উপর খুব বিশ্বাস, এক হাতে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, আর এক হাতে ঘোড়ার ঘাড়ের রোমরাশি।

পরে জানা গেল, সেটি সার্কাসের ঘোড়া। সেই যে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকিয়া গেল রায় সাহেবের মনে, সেই হইতে ও-জানোয়ারটি সম্বন্ধে চাণক্যের উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছেন, সার্কাসের ঘোড়া বা বাহিরের ঘোড়া বাছেন না, ভাবেন, রেসের ঘোড়া হইলেই বিপদ কম হইত নাকি ? সে বরং আরও বড় করিয়া চক্কর মারিত।

কিন্তু রায়-সাহেবির মোহ, উপায় কি ?

তাহা ছাড়া আরও একটু কথা আছে। নিশ্চিন্ত জীবনের সবচেয়ে যাহা বড় চিন্তা, কিছুদিন হইতে তিনি তদ্দ্বারা নির্মমভাবে আক্রান্ত। পরিবর্দ্ধমান ভুঁড়ি তাঁহাকে হিমসিম খাওয়াইয়া ছাড়িতেছে। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, এর দাওয়াই—বেড়ানো, সেটা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ওরা রব তুলিয়াছিল, তাহা হইলে ঘোড়ায় চড়ুন। বিশ্রী রকম গরম পড়িয়া কষ্ট বাড়িয়াছে। দোমনা হইয়া কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছিলেন, মন্দ কি ! একটা তেমন শান্তশিষ্ট, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসপরায়ণ, বাধ্য, ভব্যসভ্য, নিরীহ, গোবেচারী গোছের ঘোড়া যদি পাওয়া যাইত।

এই সময়টায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তলব করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে দিন চলিয়া গেলেন, সেই দিন বৈকালে সাহেবের সহিস আমির হোসেন ঘুড়ীটাকে আনিয়া হাজির করিল। একটা জিনিস বটে ! দীর্ঘ নিটোল শরীর, উন্নত বর্ত্তুল গ্রীবা, বিশাল চক্ষু দুইটি প্রাণের দীপ্তিতে ভরা, এক মুহূর্ত্ত সুস্থির নয়—চনমন চনমন করিতেছে, ক্ষুরের আওয়াজে আর সাজের মসমসানিতে জায়গটা যেন জাগিয়া উঠিল। আমির হোসেন জানাইল, ঘুড়ীর নাম—কুইন অ্যান।

পারিষদেরা বলিল, হ্যাঁ, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী বটে ; গা নয় তো, কাচ—মাছি বসলে পিছলে পড়বে।

অতি মসৃণ গাটার দিকে চাহিয়া রায় সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, হুঁ, তবে আমি তাড়াতাড়ি ওকে কিছু বলছি না। খাক-দাক জিরুক কদিন। ঘোড়ার নিয়ম হচ্ছে, মাঝে মাঝে বেশ দিনকতক বসিয়ে রাখা।

যাহারা ঘোড়ার সম্বন্ধে কিছু বুঝেন, তাঁহাদের বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, ঘোড়ার নিয়ম ঠিক বিপরীত। অভিজ্ঞ আমির হোসেন রায় সাহেবের ভুলটা শুধরাইয়া দিতে যাইতেছিল, পারিষদদিগের একজনের চোখ-টিপুনিতে থামিয়া গেল।

রায় সাহেব বিচক্ষণের মত একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, আচ্ছা, ঘোড়া এত মোটা হওয়া কি ভাল—কোনখানে একটু টোল নেই, তোমরা কি বল হে ?

দুই-একজন ব্যাপারটা বুঝিল, মাছি পিছলানোর কথাটা রায় সাহেবকে ভড়কাইয়া দিয়াছে। বলিল, আজ্ঞে, ঘোড়া একটু যদি

রোগাশোগা না হ'ল তো কি হ'ল ? যদি নিজের মাংস বইতেই হয়রান হ'ল তো সওয়ারী বইবে কখন ?

একজন বলিল, আর তা হ'লে তো ঘোড়ায় না চ'ড়ে লোকে গোল বালিশেই চড়তে পারত হুজুর।

রায় সাহেব বলিলেন, দৌড়োয় কেমন আমির হোসেন ? মানে, ইয়ে তো বেশ ?

আমির হোসেন গর্ব্বের গাঢ়স্বরে বলিল, তীরের মত হুজুর, একটু রাশ আলগা দিয়ে একটুখানি ঈশারা, বাস্, আর দেখতে হবে না।

রায় সাহেব বিবর্ণমুখে বলিলেন, আমিও তাই চাই। ভাল কথা, থামাবার ইশারাটা কি ? ওর নাম কি, সব ঘোড়া আবার একই ইশারাতে থামে না কিনা ; আমি ছেলেবেলায় যে ঘোড়াটায় চড়তাম—

থামানো এক হ্যাঙ্গাম হুজুর, এক-এক বার দেখেছি, রাশ টেনে প্রায় শুয়ে পড়তে হয়েছে সাহেবকে, তবে থেমেছে !

ঘুড়ীটা ছটফট করিতেছিল, পিঠে দুইটা সাবাসির চাপড় কষিয়া আমির হোসেন বলিল, তবে আর বলছি কি, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী একেবারে। তবে একটা বড় দোষ আছে।

রায় সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, কি, কি দোষ ? আগ্রহটা চাপিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু বেশ বুঝা গেল, অশ্বিনীর গুণের তালিকায় ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইয়া দোষের আশায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমির হোসেন বলিল, এক-এক সময় কি দোষ হয়, কোনমতেই চাল ধরে না তখন।

চাল ধরে না মানে কি ? দৌড়ুতে চায় না ?

দৌড়ুনো দূরের কথা, বিলকুল নড়তে চায় না। এ ঝোঁক এক-একবার দু-তিন দিন পর্য্যন্ত থেকে যায়। সাহেব কত ডাক্তার দেখালেন, কত—

নড়তে চায় না মানে কি ? অনেক ঘোড়া চলবে না, কিন্তু একই জায়গায় ঘুরপাক খাবে, অন্তত সেটুকুও নিশ্চয় চলে তো ?

আজ্ঞে না, চারিটি নাল পুঁতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, হাজার মারুন, পিটুন, লোভ দেখান, কিছুতেই কিছু হয় না।

রায় সাহেবের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছেন যেন, ভাবটা এই রকম করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তো, পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়বে না ? বেশ, এমনই আপাতত তুমিই ফেরি দাওগে রোজ, তবে এই রকম একগুঁয়েমি ধরলে আমায় খবর দিও, শায়েস্তা ক'রে দোব।

আমির হোসেন সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলেন,

হ্যাঁ, আর দেখ আমির হোসেন, ফেরি করবার সময় তুমি আর ওকে দৌড় করিও না; আপাতত দৌড়ের অভ্যাসটা যাক। আমি ওই পা পর্দাতে দাঁড়ানো থেকে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করা, তারপরে একটু একটু কায়দামাফিক দৌড়ুনো, তারপর আরও জোরে, এই ক'রে একেবারে গোড়া থেকে তোয়ের করব। একটি বছরের বেশি লাগবে না।

আমির হোসেন বিস্ময়াভিভূত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, একজন পারিষদের ইশারায় আর একটা সেলাম করিয়া 'যে আজ্ঞে হুজুর' বলিয়া চলিয়া গেল।

৩

ঘুড়ীটা নূতন আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া তিন-চার দিন বেজায় মনমরা হইয়া রহিল। আমির হোসেন ঘুড়ীর সহিত এত্তালা করিল, সাহেবকে দেখতে না পেয়ে কিছু খাচ্ছে-টাচ্ছে না হুজুর, তিন দিনেই যেন গ'লে গেছে।

রায় সাহেব বলিলেন, জোর ক'রে খাওয়ানোর দরকার নেই, ওদের সয় না।

একটু থামিয়া বলিলেন, মেহনৎ করাচ্ছ তো?

আজ্ঞে, এত কাহিলের ওপরে—

পারিষদের একজনের চোখ-টিপুনিতে আমির হোসেন কথাটা আর শেষ করিল না; একটু থামিয়া বলিল, আজ বিকেলে একবার বের করেছিলাম, দেখলাম, নড়তে নারাজ। ভাবলাম, যাক, দুদিন আর ফেরি দোব না, হুজুরেরও মানা আছে।

রায় সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, ওই তো আমির হোসেন, ঘোড়ার মেজাজ বুঝতে তোমার এখনও দেরি আছে। এই তো মেহনৎ নেবার সময়; ঘোড়ার জেদ বাড়তে দিয়েছ কি বিগড়েছে,—ঘোড়ার আর রেয়তের। ও কাজের কথা নয়, সকালে একবার নিয়ে এস, বাছাধন বুঝুন কার পাল্লায় পড়েছেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, তা ব'লে যেন খাওয়াতে জেদ ভাঙতে যেও না, পিঠে সইবে ব'লে যে পেটেও সইবে, তা ভেবো না।—বলিয়া রসিকতায় আবার হাসিয়া উঠিলেন। সকলে যোগ দিল। ঘুড়ীটা মাথা নীচু করিয়া ডান ক্ষুর দিয়া রাস্তা চাঁছিতেছিল, ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া নাক কাঁপাইয়া একটা আওয়াজ করিল।

কি ভাবিল, অথবা কিছু ভাবিল কি না, সেই জানে। রাত্রে দেখা গেল, তাহার অগ্নিমান্দ্যটা হঠাৎ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। চার দিনের না হোক, দিন দুইয়ের আহার সে দিব্য পুষাইয়া লইল এবং বেশ স্ফূর্তির

সহিত অঙ্গচালনা করিতে লাগিল। মোটের উপর বেশ বুঝা গেল, ও স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, যাওয়া-আসা, মিলন-বিরহ পৃথিবীতে চিরকালই চলিতেছে, উহার জন্য শোকে ঘাস-জল ছাড়িয়া দিলে শুধু আত্মনির্যাতনই সার হয়; এবং বোধ করি, এও ভাবিল যে, তাহাতে শুধু দুশমনের মুখেই হাসি ফুটে মাত্র।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত যত রকম ঘোড়ায় চড়িবার সাজগোজ শরীরকে ভারাক্রান্ত এবং জবরজঙ্গ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমস্তই কয়েকদিন পূর্বে কেনা হইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া রায় সাহেব ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া সযত্নে গোলমাল করিয়া সবগুলি পরিধান করিলেন। আজ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার ফোটো লওয়া হইবে, বহুদিনের সাধ। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, একখানা টাঙানো থাকিবে বারান্দায়, একখানা বৈঠকখানায়, একখানা শোবার ঘরে। প্রত্যেক পারিষদ এক-একখানা করিয়া দস্তখত করা ছবি পাইবে। খান-পনেরো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

শহর হইতে ফোটোগ্রাফার আসিয়াছে, সাড়ম্বরে ক্যামেরা ঠিকঠাক করিতেছে। রায় সাহেবের মনটি খুব প্রসন্ন; ঘোড়ায় চড়াও হইবে, ফোটো লওয়াও হইবে, আর এদিকে ঘোড়া এক পা নড়িবেও না, চক্কর দেওয়া তো দূরের কথা।

পারিষদেরা সব হাজির; হাসি-ঠাট্টা, ঘোড়া দুরস্ত করার গল্প চলিতেছে। রায় সাহেব বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথার পাগড়িটাতে সাধ্যমত রাজপুতী ঢং ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় আরশিতে ঘুড়ীর ছায়া পড়িল।

রায় সাহেব ঘুরিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার ঘোড়া আমির হোসেন?

আমির হোসেন ঝুঁকিয়া একটি সেলাম করিয়া সহাস্য-বদনে কহিল, হুজুরেরই কুইন অ্যান, রাত থেকে খেয়ে-দেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, চেনা যাবে কমনে থেকে? শুধু একবারটি কয়েছিলাম, দেখিস, মালিক প্রথম সওয়ারি হবেন, ইউ নোটি গেরেল!

শেষের ইংরেজীটুকু ঘুড়ীর উদ্দেশ্যে; সে শরীর দুলাইয়া দুলাইয়া অতিরিক্ত নাচ লাগাইয়া দিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে আমির হোসেনের হস্তধৃত লাগামে এক-একটা উৎকট ঝাঁকুনি দিয়া নিজের অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করিতেছিল। দাবড়ানি খাইয়া রায় সাহেবের পোশাকের উপর চক্ষু দুইটা ন্যস্ত করিয়া একটা আনন্দধ্বনি সহকারে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

আমির হোসেন বাঁ হাতটা তাহার ঘাড়ের উপর বুলাইয়া বলিল, সবুর, মালিক আসছেন; লেকিন সাচ্চা চাল দেখানো চাই, হাঁ।

রায় সাহেবের মুখটা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, বেশ বেশ, ভাল কথা ; অনন্ত, কাল বলছিলে, একবার চড়বে, না হয় ঘুরে এস না ; দোষ ব্রিচেসটা খুলে ? মানে, কথা হচ্ছে, আমার পাল্লায় পড়লে এমন টিট ক'রে ছাড়ব যে, খানিকক্ষণ ওর আর পদার্থ থাকবে না, মিইয়ে যাবে ; তখন আর চ'ড়ে সুখ পাবে না।

অনন্ত নামক পারিষদ তাড়াতাড়ি একটু হাতজোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে না হুজুর। ওরে বাবা ! কালকে মিইয়ে ছিল ব'লেই বলেছিলাম চড়ব ; নেহাত পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকছে বললে কিনা !

রায় সাহেব একবার অপর সকলের উপর চোখ দুইটা বুলাইয়া আনিলেন, কেহ চোখ নামাইয়া লইল, কেহ টুপ করিয়া দরজার আড়ালে সরিয়া গিয়া চোখে চোখ ফেলিতে দিল না। কে একজন একেবারে সামনা-সামনি ছিল, ভীতভাবে হাসিয়া বলিল, হুজুরকে বঞ্চিত ক'রে কেউ কি আগে চড়তে রাজী হবে ? হোক্ কলিযুগ, তবু—

উপায়ান্তর না দেখিয়া রায় সাহেব আরশির সামনে সরিয়া আসিয়া পাগড়িটা খুলিয়া আবার সযত্নে এবং সবিলম্বে চাপিয়া চাপিয়া বাঁধিতে লাগিলেন। আশা, যদি ইতিমধ্যে কিছু একটা হইয়া গিয়া তিনি এ যাত্রা রক্ষা পান ;—ভূমিকম্প, কি অগ্নিকাণ্ড, কি অপঘাত, যা হয় একটা কিছু, মানটা কোন রকমে যাহাতে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু পাগড়ি বাঁধা পর্য্যন্ত যথেষ্ট সময় থাকিতেও সেসব কিছুই হইল না ; যদিও ইহাতেও কোন সন্দেহ রহিল না যে, সাধের বিপদটি খুবই আসন্ন, তাঁহার ঘোড়ায় চড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। দায়ে-পড়া বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইলেন। নরম আলগা শরীরের মাংস পাতলা করিয়া মাখা ময়দার মত পোশাকের খাজে খাজে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রথম তো চড়াই একটা সমস্যা। যে পারিষদটি কলিযুগ হইলেও রায় সাহেবকে প্রথম অশ্বারোহণের আনন্দ ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে চায় নাই, সে সামনে আসিয়া বলিল, আপনি তা ব'লে যেন লাফিয়ে চড়তে যাবেন না হুজুর, এই সেদিন অমন বাতে ভুগলেন। তার চেয়ে, আমির হোসেন, তুমি এই বারান্দার পাশটায় এনে দাঁড় করাও, টুপ ক'রে উঠে পড়ুন।

রায় সাহেব সামান্য একটু ল্যাংচানোভাবে চলিতে চলিতে বলিলেন, তবে তাই আন ; হ্যাঁ, ব্যথাটা যেন একটু আউরেছে বটে।

ঘুড়ীটাকে বারান্দার পাশে আনিয়া দাঁড় করানো হইল। সে পিঠটা একটু সংকুচিত করিয়া সংশয়ান্বিত দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিল।

৪

চড়তে যা দেরি ; ঘুড়ীটা সঙ্গে সঙ্গে তরতর করিয়া প্রাণ লইয়া পালানো-গোছের করিয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল ; আমির হোসেনের হাতেই লাগামটা ছিল, অতি কষ্টে রুখিয়া ফেলিল। গালে পিঠে হাত বুলাইয়া আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; বলিল, ঠাণ্ডা রহ বেটী, ভয় নেই।

রায় সাহেব উঠিয়াই দুই হাতে কুইন অ্যানের ঘাড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই প্রশ্ন করিলেন, ফোটো তোলা হচ্ছে না তো ?

ফোটোগ্রাফার বলিল, তুলি নি এখনও ; আপনি যেই একটু স্টেডি হয়ে বসবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে এক্সপোজার দোব ; সেইজন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

রায় সাহেব মাথাটা তুলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কুইন অ্যান হঠাৎ সামনের পা দুইটা মুড়িয়া পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিতে আবার মাথাটা গুঁজড়াইয়া পড়িলেন এবং ওরই মধ্যে নির্ভুল হিসাব করিয়া বলিলেন, আপনি তা হলে কাল আসবেন, খবর দোব। আমির হোসেন কাছে আছে তো ?

এই যে রয়েছি হুজুর, লাগামটা দোব ?

না না, ধ'রে থাক, লাগাম চাইছি না, জিজ্ঞাসা করছিলাম—ওই আবার উঠল ; টেনে নামাও টেনে নামাও আমির হোসেন ; ব'সে পড় ভুঁয়ে। শিবু বেয়ারাকে ডেকে নাও, ভারী আছে।

আমির হোসেন টানিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেই কুইন অ্যান সামনের পায়ে ভর দিয়া পিছনে লাফাইয়া উঠিল।

রায় সাহেব ঘাড়ের দিকে খানিকটা পিছলাইয়া গিয়া আর্তস্বরে বলিলেন, তোমরা কেউ ল্যাজ চেপে ধর, কিছু বলবে না, খুব ঠাণ্ডা ঘো···

আমির হোসেন তাড়াতাড়ি সাবধান করিয়া দিল, না না, ল্যাজে হাত দিলে আজ ও বরদাস্ত করবে না, একে মন ভাল নেই, মোটে এই একটু ফুর্তি জ'মে আসছে—

রায় সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, তা হ'লে ? এ যে একবার সামনে একবার পেছনে উঠছে, এ কোন দেশী ফুর্তি আমির হোসেন ? বাপ রে, যেন কাপড়-কাচা করছে !

সাহেব পিঠে হাত ঠুকে বলতেন, 'ডার্লিং, প্রিটি ডিয়ার।' তাই বলুন না হুজুর !

পারিষদদের মধ্যে একজন বলিল, ডার্লিং তো মেমকে বলে সাহেবরা, সে কথা উনি ঘুড়ীকে কেমন ক'রে—

আওয়াজ পাইয়া রায় সাহেব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, তোমরা বুঝি সব তামাশা দেখছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? মেমসাহেবকে বলে—কেন, একে বললে কি অন্যায়টা হয়? ডার্লিং ডার্লিং, ডার্লিং—তুমি সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে হাতটা ঘুরিয়ে ঠুকতে থাক আমির হোসেন, যেন মনে করে, আমি ঠুকছি, মানে সায়েব ঠুকছে। আর কি বলতেন সায়েব?

'প্রিটি ডিয়ার' বলুন হুজুর।

প্রিটি ডিয়ার—এই রে! লাগাম ক'ষে ধরে থেকো। প্রিটি ডিয়ার!

বলুন, নোটি গেরেল।

দেখো দেখো, অন্যমনস্ক হ'য়ো না। না, ওটা আর বলে কাজ নেই, বড্ড যেন বোঝে। গুড গার্ল বলতেন কি সায়েব? বললে বুঝতে পারবে? যাদুমণি সোনামণি এই রকম কতকগুলা বাংলা শেখাও এবার আমির হোসেন, যেমন শুনতে মিষ্টি, তেমনই—ধর ধর, ধর আমির হোসেন; আমি ভাবছি, নেমে আবার ভাল ক'রে উঠব; বেদখল ক'রে ফেলেছে,, বারান্দার কাছে আর একবার নিয়ে যেতে পার?

যাচ্ছি হুজুর, তবে সায়েব বারান্দার ওপর পা তুলে রুটি খেতে শিখিয়েছিলেন, তাই ভাবছি—যদি হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়, আপনি এখন পিঠে রয়েছেন।

না না, তবে কাজ নেই; আর একটু দূরে সরিয়ে নাও বরং। বারান্দা থেকে কতটা দূরে আছে আমির হোসেন? দূরে গিয়েই বরং ভাল ক'রে দাঁড় করাও, নেমে পড়ি।

আমির হোসেন আর একটা সামনে উঠিবার ঝোঁক সামলাইতে সামলাইতে বলিল, নামতে গেলেই বাগড়া দেবে; মনটা ভাল আছে কিনা, একটু নাচতে কুঁদতে চায়; খালি জিন পছন্দ করবে না এখন। ভাল ওয়েলার হুজুর, ওদের রেওয়াজই এই।

রায় সাহেব নিরাশভাবে বলিলেন, সর্ব্বনাশ! তা হ'লে? নামতেও বাগড়া দেবে, পিঠে রেখেই বা কি ভাল ব্যবহারটা করছে? একি ফ্যাসাদে পড়া গেল।

কুইন অ্যান আরও দুই-একবার সামনে এবং পিছনে পা তুলিয়া নিজের শরীরটা নানাভাবে দুলাইয়া দুলাইয়া যেন আমির হোসেনের কথাটার সমর্থন করিল, তাহার পর চিঁ-হিঁ-হিঁ করিয়া একটা সুদীর্ঘ হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল।

গলাটা বেশ ভাল করিয়া ধরিয়া রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন, ডাকলে কেন ওরকম ক'রে আমির হোসেন? বারান্দার টেবিলের ওপর আমার পেলটে পাউরুটি প'ড়ে আছে, শিগগির সরিয়ে নিতে বল তো।

না হুজুর, ডাকার পরে কুইন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ও ওর একটা লুটিস হচ্ছে।

রায় সাহেব তদবস্থ হইয়াই একটু পড়িয়া রহিলেন। পরে অতি সাবধানে মাথাটা সামান্য একটু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিক বলছ তো ? দেখো।

হ্যাঁ হুজুর, প্রায়ই তো এই রকম—

তাড়াতাড়ি আবার শুইয়া পড়িয়া রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন, প্রায়ই মানে ?

না, আর ভয় নেই হুজুর, বসুন সিধে হয়ে।

ভয় কথাটা বোধ হয় পৌরুষে বড় বেশি ঘা দিল ; তাহা ছাড়া ঘুড়ীটাও সত্যই আর নড়াচড়া করিতেছে না। রায় সাহেব সতর্কভাবে এবং আমির হোসনকে খুব সতর্ক করিতে করিতে সিধা হইয়া বসিলেন। আমির হোসেন লাগামটা দিতে যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, আগে তুমি এক হাতে ওর ঘাড়ের চুলটা ধর ক'ষে। আর দেখ, ঘাড়ের চুল বেশি ছোট ক'রে ছেঁটে কাজ নেই, বড় চুলেই ঘুড়িকে মানায় ভাল।

পারিষদরা আবার আগাইয়া আসিয়াছিল। অনন্ত বলিল, আজ্ঞে, তা তো মানাবেই, ঘুড়ী হ'ল মেয়ে-ঘোড়া কিনা।

রায় সাহেব ঘুড়ীর কানের মাঝখানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া ছিলেন। মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, অনন্ত ?

অনন্ত আরও আগাইয়া আসিয়া উত্তর করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

যেন ঠাণ্ডা হয়েছে, না ?

হতেই হবে হুজুর, কার পাল্লায়—

ফোটোগ্রাফার চ'লে গেছে ?

দূরে বারান্দার এক কোণ হইতে উত্তর আসিল, না, এই তো রয়েছি।

অনন্ত বলিল, যান না, এই বেলা টুপ ক'রে ফোটোটা তুলে নিন না মশাই। হুজুর তো বেটীকে শায়েস্তা ক'রে এনেইছেন।

ফোটোগ্রাফার আস্তে আস্তে নামিয়া প্রায় বিশ হাত দূরে স্ট্যাণ্ডটা দাঁড় করাইয়া ক্যামেরাটা বসাইল। নিজে কালো পর্দার ভিতর ছয়-সাত বার মাথা গলাইয়া, বাহির করিয়া প্রায় মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফোকাস ঠিক করিল। কুইন অ্যান স্থির, ল্যাজটি পর্য্যন্ত নড়ে না। ফোটোগ্রাফার চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, ঠিক হয়েছে, আর সেকেণ্ড কয়েক, দেখবেন, যেন—

লেন্সের মুখ হইতে ক্যাপটা খুলিয়া লইয়া কায়দা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, ওয়ান, টু—

কুইন অ্যান এতক্ষণ পরে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়চোখে দেখিয়া লইল, এবং থ্রী বলার সঙ্গে সঙ্গে চিঁ-হিঁ-হিঁ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলকে ঘুরিয়া গিয়া ক্যামেরার একেবারে সামনা-সামনি হইয়া দাঁড়াইল।

ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা ছাড়িয়া 'বাপ রে বাপ' বলিয়া তিন লাফে গিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। যাহারা বারান্দায় ছিল, তাহারা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রায় সাহেব লাগাম ছাড়িয়া গলা আঁকড়াইয়া শুইয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমির হোসেন তাড়াতাড়ি আসিয়া লাগামটা ধরিয়া ফেলিল।

একটু রুক্ষভাবেই বলিল, ওয়ান টু—ওসব বলবার কি দরকার ছিল ওনার? ওই ব'লে সায়েব এদানি ওকে হার্ডল ডিঙুতে শেখাচ্ছিল, ওনার ওই তিন-ঠ্যাঙে জিনিসটা দেখে ভাবলে বুঝি—

রায় সায়েব শুইয়া শুইয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, সরিয়ে নাও ফোটোগ্রাফার, ওটা সরিয়ে নাও। হার্ডল রেস—সেই সাত বেড়া ডিঙিয়ে ছোটে তো? নিয়েছ সরিয়ে?

কুইন অ্যানের হার্ডল ডিঙাইবার ইচ্ছা ছিল কি না, বলা যায় না: কিন্তু সম্ভাবনার পূর্ব্বেই তিন-চারজন আসিয়া স্ট্যান্ড ও ঢাকনাসুদ্ধ ক্যামেরাটা বারান্দায় তুলিয়া ফেলিল। কুইন অ্যান সামনের ডান ক্ষুরটা দিয়া কাঁকরের রাস্তাটা চার-পাঁচ বার জোরে জোরে আঁচড়াইল, তারপর খুব আস্তে আস্তে শরীর আন্দোলিত করিয়া সামনে চলিতে আরম্ভ করিল। রায় সাহেব ঘাড়ের রোমরাশির ভিতর হইতে রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করিলেন, কোথায় চলল বল তো আমির হোসেন? ক্যামেরাটা বারান্দায় না ঘরে?

মন-মরা হয়ে যেন আস্তাবলে চলল ব'লে বোধ হচ্ছে। ওর ইচ্ছেটা ছিল একটু ঘুরে ফিরে আসা হুজুর, শেষ নাগাদ একটু ডিঙুবে ব'লে আশা করেছিল, তাও হ'ল না, ওর দিল ভেঙে গেছে, দেখছেন না?

রায় সাহেব মুখ না তুলিয়াই বলিলেন হুঁ। যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া তিনি ঘুড়ীর ভাঙা দিল প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

একটু পরে প্রশ্ন করিলেন, যাচ্ছে তো ঠিক আস্তাবলের দিকে আমির হোসেন? কোনখানটায় এল? কতক্ষণ থাকে বল তো মন-মরা ভাবটা? আর মিনিট পাঁচ-ছয় থাকবে না?

পরদিন সকালে রায় সাহেব একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। পারিষদেরা উপস্থিতই ছিল। অনন্তকে বলিলেন, তুমি ঠিক বলেছ অনন্ত, বাতটা একেবারে সেরে না গেলে ঘোড়ায় চড়াটা কাজের কথা নয়। দিব্যি পছন্দ হয়েছিল ঘুড়ীটা হে, যেমন দেখতে, তেমনই তেজী, কাল দেখলাম কিনা একটু নেড়ে-চেড়ে। ভেবেছিলাম, মনের মতনটি ক'রে গ'ড়ে নোব। কিন্তু না, তুমি দিয়ে দাও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন। সামনের শীতটা যাক, তখন আবার একটা কিনে নিতেই বা কতক্ষণ?

পারিষদের মধ্যে একটি নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

লোহার বিস্কুট

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কমলবাবু বললেন, 'আমি পাড়াতেই থাকি, হিন্দুস্থান পার্কের কিনারায়। আপনাকে অনেকবার দেখেছি, আলাপ করবার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু সাহস হয়নি। আজ একটা সূত্র পেয়েছি, তাই ভাবলাম এই ছুতোয় আলাপটা করে নিই। আমার জীবনে একটি ছোট সমস্যা এসেছে—'

'সমস্যা!' ব্যোমকেশ সিগারেটের কৌটো এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বলুন বলুন, অনেকদিন ও বস্তুর মুখদর্শন করিনি!'

গ্রীষ্মের একটি রবিবার সকালে ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। কমলবাবুর চেহারাটি নাড়ুগোপালের মত, কিন্তু মুখের ভাব চটপটে বুদ্ধিসমুদ্ধ। তিনি হাসিমুখে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন, তারপর গল্প আরম্ভ করলেন, 'আমার নাম কমলকৃষ্ণ দাস, কাছেই ভারত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা আছে, আমি সেখানকার ক্যাশিয়ার। বছর দেড়েক আগে পুরুলিয়া থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছি।

'কলকাতায় এসেই মুশকিলে পড়ে গেলাম; কোথাও বাসা খুঁজে পাই না। শেষ পর্যন্ত একটি লোক তার বাড়ির নিচের তলায় একটি ঘর ছেড়ে দিল। ফ্যামিলি আনা হল না, স্ত্রী আর মেয়েকে পুরুলিয়ায় রেখে একলা বাসায় উঠলাম।

'বাড়িওয়ালার নাম অক্ষয় মণ্ডল। বাড়িটি দোতলা; নিচের তলায় দুটি ঘর, ওপরে দু'টি; যাতায়াতের রাস্তা আলাদা। অক্ষয় মণ্ডল দোতলায় একলা থাকে, কিন্তু তার কাছে লোকজনের যাতায়াত আছে। মিষ্টভাষী লোক, কিন্তু কী কাজ করে বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমার ঘরে এসে গল্পসল্প করত, কিন্তু আমাকে কোনদিন দোতলায় ডাকত না। পড়শীদের সঙ্গেও যাতায়াত ছিল না। আমাদের ব্যাঙ্কে ওর একটা চালু খাতা ছিল।'

যাহোক, এইভাবে মাস তিনেক কাটার পর একদিন একটা ছুটির দিনে আমার অফিসের একজন সহকর্মী বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে নেমন্তন্ন ছিল। ফিরতে রাত হয়ে গেল। বাসায় ফিরে দেখি অক্ষয় মণ্ডল দোতলা থেকে নেমে এসে সিঁড়ির দরজায় তালা লাগাচ্ছে, তার পায়ের দু'পাশে দু'টি সুটকেশ। বললাম, 'একি, এত রাত্রে কোথায় চললেন?'

আমায় দেখে অক্ষয় মণ্ডল কেমন হকচকিয়ে গেল; তারপর সুটকেশ দুটো দুহাতে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, একটু গাঢ় গলায় বলল,

'কমলবাবু, আমাকে হঠাৎ বাইরে যেতে হচ্ছে। কবে ফিরব কিছু ঠিক নেই।'

'দেখলাম তার চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে। বললাম, 'সে কি, কোথায় যাচ্ছেন ?'

'তার মুখে হাসির মত একটা ভাব ফুটে উঠল। সে বলল, 'অনেক দূর। আচ্ছা, চলি।'

'আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল, তারপর ফিরে এসে বলল, 'কমলবাবু, আপনি সজ্জন, ব্যাঙ্কে চাকরি করেন ; আপনাকে একটা কথা বলে যাই। সাত দিনের মধ্যে আমি যদি ফিরে না আসি, আপনি আমার পুরো বাড়িটা দখল করবেন। আপনাদের ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউণ্ট আছে, মাসে মাসে দেড়শো টাকা ভাড়া আমার খাতায় জমা দেবেন।—আচ্ছা।'

'অক্ষয় মণ্ডল চলে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বিস্ময়ের চটকা ভেঙে খেয়াল হল, অক্ষয় মণ্ডল তার দোরের চাবি আমাকে দিয়ে যায়নি।'

'সে যাহোক, আস্ত বাড়িটা পাওয়া যেতে পারে এই আশায় মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মনে হল অক্ষয় মণ্ডল অগস্ত্য যাত্রা করেছে, আর শীগগির ফিরবে না।'

'পরদিন সকালে স্ত্রীকে চিঠি লিখে দিলাম—সংসার গুটিয়ে তৈরি থাকো, বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

আশায় আশায় দুটো দিন কেটে গেল। তিন দিনের দিন গন্ধ বেরুতে আরম্ভ করল। বিকট গন্ধ, মড়া-পচা গন্ধ। গরমের দিনে মাছ মাংস পচে গিয়ে যে-রকম গন্ধ বেরোয় সেই রকম গন্ধ আসছে।

'সন্দেহ হল, পুলিসে খবর দিলাম। পুলিস এসে তালা ভেঙে ওপরে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখি বীভৎস কাণ্ড। ঘরের মেঝের ওপর একটা মড়া হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার কপালে একটা ফুটো। সে-রাত্রে আমি যখন নেমতন্ন খেতে গিয়েছিলাম, সেই সময় অক্ষয় মণ্ডল লোকটাকে গুলি করেছে, তারপর দামী জিনিসপত্র টাকাকড়ি সুটকেশে পুরে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

'দেখতে দেখতে একপাল পুলিস এসে বাড়ি ঘিরে ফেলল। লাশ ময়না তদন্তের জন্যে পাঠানো হল। দারোগাবাবু আমাকে জেরা করলেন। তারপর খানাতল্লাশ আরম্ভ হল। নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে পাড়ার একটি ভদ্রলোক এবং আমি সঙ্গে রইলাম।'

'খানাতল্লাশে কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। কেবল একটা দেরাজের মধ্যে কয়েকটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি কৌটোর মত জিনিস পাওয়া গেল ; সিগারেটের প্যাকেটে রুপোলি তবকের মধ্যে যেমন

সিগারেট মোড়া থাকে, অনেকটা সেই রকম লম্বাটে ধরনের তবক, খুব পাতলা লোহা দিয়ে তৈরি, কিন্তু তার অভ্যন্তর ভাগ শূন্য। দারোগাবাবু সেগুলো নিয়ে চিন্তিতভাবে নাড়াচাড়া করলেন, কিন্তু হালকা লোহার মোড়ক কোন্ কাজে লাগে বোঝা গেল না!'

'যাহোক, সেদিনকার মত তদন্ত শেষ হল, পুলিশ চলে গেল। আমার মনে কিন্তু অস্বস্তি লেগে রইল। তিন-চার দিন পরে থানায় গেলাম। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে; আঙুলের ছাপ ও অন্যান্য দৈহিক চিহ্ন থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে মৃত ব্যক্তির নাম হরিহর সিং; দাগী আসামী ছিল, মাদকদ্রব্য এবং সোনা-রূপোর চোরা কারবার করত। অক্ষয় মণ্ডলের সঙ্গে কোন সূত্রে তার যাতায়াত ছিল, তা জানা যায়নি। অক্ষয় মণ্ডলের নামে হুলিয়া জারী হয়েছে; কিন্তু সে এখনো ধরা পড়েনি, কর্পূরের মত উবে গেছে।'

'থানা থেকে ফেরার সময় ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, 'পুরো বাড়িটা তাহলে আমি দখল করতে পারি?'

দারোগাবাবু বললেন, 'স্বচ্ছন্দে। আসামী যখন ফেরার হবার আগে আপনাকে তার বাড়ির হেপাজতে রেখে গেছে, তখন আপনি থাকবেন বৈকি। তবে একটা কথা, যদি আসামীর সাড়াশব্দ পান, তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দেবেন।'

'তারপর প্রায় বছরখানেক ভারি আরামে কেটেছে। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে এলাম, সারা বাড়িটা দখল করে দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে বাস করছি। বাড়ির ভাড়া মাসে মাসে অক্ষয় মণ্ডলের খাতায় জমা করে দিই। তার টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আলমারি বাক্স কাবার্ডে হাত দিই না, পুলিস খানাতল্লাশ করার পর যেমনটি ছিল তেমনি আছে।'

'হঠাৎ মাস দুই আগে এক ফ্যাসাদ উপস্থিত হল। সকালবেলা নিচের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি, একজন অপরিচিত লোক এল, তার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যবয়স্ক পুরুষ, স্ত্রীলোকটি সধবা। পুরুষ স্ত্রীলোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে অক্ষয় মণ্ডলের স্ত্রী, আমি ওর বড় ভাই! এতদিন আমি ওকে পুষেছি, কিন্তু আর আমার পোষবার ক্ষমতা নেই। এবার ও স্বামীর বাড়িতে থাকবে। আপনাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

'মাথায় বজ্রাঘাত। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। তারপর বুদ্ধি গজালো, 'অক্ষয়বাবুর স্ত্রী আছেন, তা কোনদিন শুনিনি। যদি আপনার কথা সত্যি হয়, আপনি আদালতে গিয়ে নিজের দাবী প্রমাণ করুন, তারপর দেখা যাবে।'

'কিছুক্ষণ বকাবকি কথা-কাটাকাটির পর তারা চলে গেল। আমার সন্দেহ হল, এরা দাগাবাজ জোচ্চোর, ছলছুতো করে বাড়িটা দখল করে

বসতে চায়। আজকাল বাসা-বাড়ির যে রকম ভাড়া দাঁড়িয়েছে, ফোকটে বাসা পেলে কে ছাড়ে।'

থানায় গিয়ে খবরটা জানিয়ে এলাম। দারোগাবাবু বললেন, 'অক্ষয় মণ্ডলের স্ত্রী আছে কিনা আমাদের জানা নেই। যাহোক, আবার যদি আসে, ছলছুতো করে থানায় নিয়ে আসবেন। আমরাও বাড়ির ওপর নজর রাখ।'

আমার পিস্তল আছে, তাছাড়া একটা কুকুর পুষেছি। হিংস্র পাহাড়ী কুকুর, নাম ভুটো ; আমার হাতে ছাড়া কারুর হাতে খায় না। আমি ব্যাঙ্কে যাবার সময় তার শেকল খুলে দিই, রাত্তিরে তাকে ছেড়ে দিই, সে বাড়ি পাহারা দেয়। ভুটো ছাড়া থাকতে বাড়িতে চোর-ছ্যাঁচড় ঢোকার ভয় নেই, ভুটো তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তবু এই ঘটনার পর মনে একটা অস্বস্তি লেগে রইল। অক্ষয় মণ্ডল লোক ভাল নয়, হয়তো নিজে আড়ালে থেকে কোনো কুটিল খেলা খেলছে।

'দিন দশেক পরে একখানা বেনামী চিঠি পেলাম, 'পাড়া ছেড়ে চলে যাও, নইলে বিপদে পড়বে।'—পাড়া মানেই বাড়ি। থানায় গিয়ে চিঠি দেখালাম। দারোগাবাবু বললেন, 'চেপে বসে থাকুন, নড়বেন না। আপনার বাসার ওপর পাহারা বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

'তারপর থেকে এই দেড় মাস আর কেউ আসেনি, উড়ো চিঠিও পাঠায়নি। এখন বেশ নিরাপদ বোধ করছি। কিন্তু একটি সমস্যার উদয় হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই আপনার কাছে আসা। দারোগাবাবুর কাছে যেতে পারতাম, কিন্তু তিনি হয়তো এমন উপদেশ দিতেন যা আমাদের পছন্দ হত না।'

'ব্যাপারটা এই : ব্যাঙ্ক থেকে আমার এক মাসের ছুটি পাওনা হয়েছে। আমার স্ত্রীর অনেক দিন থেকে তীর্থে যাবার ইচ্ছে। হরিদ্বার, হৃষিকেশ এইসব। ব্যাঙ্কের একটি সহকর্মীও আমার সঙ্গেই ছুটি নিয়ে কুণ্ডু স্পেশালে বেড়াতে বেরুচ্ছেন, আমাকেও তিনি সঙ্গে যাবার জন্যে চাপাচাপি করছেন। দল বেঁধে গেলে অনেক সুবিধে হয়। আমার স্ত্রী খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আমার উৎসাহও কম নয়। কিন্তু—'

'যেতে হলে বাড়িতে তালা বন্ধ করে যেতে হবে! ভুটোকেও মাসখানেকের জন্যে একটা কেনেলে ভর্তি করে দিতে হবে। বাড়ি অরক্ষিত থাকবে। মনে করুন, এই ফাঁকে অক্ষয় মণ্ডলের বৌ—মানে, ওই স্ত্রীলোকটা যদি তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে বাড়ি দখল করে বসে, তখন আমি কি করব? অক্ষয় মণ্ডলের মৌখিক অনুমতি ছাড়া আমার তো কোনো হক নেই। তবে আমি দখলে আছি, আমাকে বেদখল করতে হলে ওদের আদালতে যেতে হবে। কিন্তু ওরা যদি দখল নিয়ে বসে, তখন আমি কোথায় যাব?'

'এই আমার সমস্যা। নিতান্তই ঘরোয়া সমস্যা। আপনার নিরীক্ষার উপযুক্ত নয়। তবু রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হবে, এই মতলবে আপনার কাছে এসেছি। এখন বলুন, বাড়িখানি রেখে আমাদের তীর্থযাত্রা করা উচিত হবে কি না।'

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইল, শেষে বলল, 'আপনাদের তীর্থযাত্রায় বাধা দিলে পাপ হবে, আবার বাড়িটা বেহাত হয়ে যাওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। আপনার জানাশোনার মধ্যে এমন মজবুত লোক কি কেউ নেই, যাকে বাড়িতে বসিয়ে তীর্থযাত্রা করতে পারেন?'

'কই, সে রকম কাউকে তো দেখছি না। সকলেরই বাসা আছে। যাদের নেই তাদের বসাতে সাহস হয় না, শেষে খাল কেটে কুমীর আনব!'

'তাহলে চলুন, আপনার বাসাটা দেখে আসি।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল।

কমলবাবু উৎফুল্ল চোখে চাইলেন, 'যাবেন! কী সৌভাগ্য! চলুন চলুন, বেশি দূর নয়—'

'একটু বসুন। বেশি দূর না হলেও রোদ বেশ কড়া। একটা ছাতা নিয়ে আসি।'

ব্যোমকেশ ভিতরে গিয়ে ছাতা নিয়ে এল। ছাতাটি ব্যোমকেশের প্রিয় ছাতা; অতিশয় জীর্ণ, লোহার বাঁট এবং কামানিতে মরচে ধরেছে, কাপড় বিবর্ণ এবং বহু ছিদ্রযুক্ত। এই ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বেরুলে নিজে অদৃশ্য থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অনুসরণ করা যায়; ফুটো দিয়ে বাইরের লোককে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের লোক ছাতাধারীর মুখ দেখতে পায় না। সত্যান্বেষীর উপযুক্ত ছাতা।

'চলুন।'

কমলবাবুর বাসা ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। মাঝে মাঝে এ পথ দিয়ে যাবার সময় বাড়িটি ব্যোমকেশের চোখে পড়েছে; ছোট দোতলা বাড়ি; কিন্তু একটি বিশেষত্বের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সমস্ত ছাদ লোহার ডাণ্ডা-ছত্রী দিয়ে ঢাকা, যেন প্রকাণ্ড একটা লোহার খাঁচা। বাইরে থেকে কোনো মতেই ছাদে ওঠা সম্ভব নয়।

'আসুন।'

ছাতা মুড়ে ব্যোমকেশ বাড়িতে ঢুকল। কমলবাবু প্রথমে তাকে নিচের তলার বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি শতরঞ্জি-ঢাকা তক্তপোশ ও দুটি ক্যাম্বিসের চেয়ার ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ ফেরাল। সে যেন একটা সূত্র খুঁজছে, কিন্তু এই নগ্নপ্রায় ঘরে কোনো অঙ্গুলিনির্দেশ পাওয়া গেল না। সে বলল, 'নিচের তলায় আর একটা ঘর আছে, না?'

'আছে। ঘরটা অক্ষয় মণ্ডলের আমলে ব্যবহার হত না, আমি ওটাকে রান্নাঘর করেছি। দেখবেন?'

'দরকার নেই। আপনার স্ত্রী বোধ হয় এখন রান্নাবান্না করছেন। চলুন, ওপর-তলাটা দেখা যাক।'

'চলুন।'

ঘরের লাগাও একটা সরু বারান্দার শেষে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, সিঁড়ির মাথায় দরজা। দরজার মাথায় ওপরকার দেয়ালে ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মত লোহার একটা জিনিস তিনটে পেরেকের মাঝখানে আটকানো রয়েছে। ব্যোমকেশ সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ছাতা তুলে সেই দিকে নির্দেশ করে বলল, 'ওটা কি?'

'ওটা ঘোড়ার নাল। বিলিতি কুসংস্কার অনুযায়ী দোরের মাথায় ঘোড়ার নাল টাঙিয়ে রাখলে নাকি অনেক টাকা হয়।'

ব্যোমকেশের ছাতার ডগা ঘোড়ার নালে আটকে গিয়েছিল, সে টেনে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এটা কি আপনি লাগিয়েছেন নাকি?'

'না, অক্ষয় মণ্ডলের আমল থেকে আছে।'

ব্যোমকেশ ঘোড়ার নালের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কমলবাবু ডাকলেন, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভিতর কমলবাবুর দশ বছরের মেয়ে মেঝেয় মাদুর পেতে বসে লেখাপড়া করছিল, তার কাছে মাদুরের বাইরে একটা ভীষণদর্শন কুকুর থাবা পেতে বসেছিল, ব্যোমকেশের পানে মণিহীন নীলাভ চোখ তুলে চাইল। কমলবাবু বললেন, 'খুকু, যাও তোমার মাকে চা তৈরি করতে বল, আর কিছু ভাজাভুজি।'

ব্যোমকেশ একটু আপত্তি করল, কিন্তু কমলবাবু শুনলেন না। খুকু নিচে চলে গেল, ভুটো সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরটি চক্ষু দিয়ে সমীক্ষা করল। বলল, 'এ ঘরে অক্ষয় মণ্ডলের কোনো আসবাবপত্র আছে?'

কমলবাবু বললেন, 'ছিল, আমি পাশের ঘরে নিয়ে গেছি। খাট এবং একটা দেরাজওয়ালা টেবিল। এই যে।'

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড়, জানলার দিকে খাট, অন্য কোণে টেবিল। ব্যোমকেশ টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, 'সেই যে পুলিসের খানাতল্লাশে লোহার মোড়ক পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো কি পুলিস নিয়ে গিয়েছে?'

'একটা মোড়ক পুলিস নিয়ে গিয়েছিল, বাকিগুলো দেরাজে আছে।' কমলবাবু নিচের দিকের একটা দেরাজ খুলে বললেন, 'এই যে!'

দেরাজের পিছন দিকে কয়েকটা মোড়ক পড়ে ছিল, ব্যোমকেশ একটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল। আকৃতি-প্রকৃতি সিগারেট প্যাকেটের

অভ্যন্তরস্থ তবকের মতই বটে। সেটা রেখে দিয়ে সে হাসিমুখে বলল, 'ভারি মজার জিনিস তো! এর ভেতর গোটা দুই বিস্কুট রেখে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে নিশ্চিন্দি। চলুন, এবার ছাদটা দেখে আসা যাক!'

'ছাদে কিন্তু কিছু নেই!'

'তা হোক। শূন্যতাই হয়তো অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।'

'তাহলে আসুন।'

ছাদে সত্যিই কিছু নেই। লোহার ঘেরাটোপ ঢাকা ছাদটা বাঘের শূন্য খাঁচার মত দাঁড়িয়ে আছে। এক কোণে উঁচু পাদপীঠের ওপর লাল রঙের লোহার চৌবাচ্চা; এই চৌবাচ্চা থেকে বাড়িতে কলের জল সরবরাহ হয়। ব্যোমকেশ ছাদের চারিদিক সন্ধিৎসুভাবে পরিক্রমণ করে বলল, 'ছাদটা আপনারা ব্যবহার করেন না?'

কমলবাবু বললেন, 'বেশি গরম পড়লে ছাদে এসে শুই। বেশ নিরাপদ জায়গা, চোর ঢুকবে সে উপায় নেই।'

'হুঁ। চলুন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।'

নিচে নেমে এলে পর খুকু এসে বলল, 'বাবা, বসবার ঘরে চা দিয়েছি।'

নিচের তলায় ঘরে পাঁপর ভাজা ও গরম বেগুনী সহযোগে চা পান করতে করতে ব্যোমকেশ বলল 'থানার যে দারোগাবাবুর কাছে আপনার যাওয়া-আসা, তাঁর নাম কি?'

কমলবাবু বললেন, 'তাঁর নাম রাখাল সরকার।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসল। চা শেষ করে সে ছাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি।'

কমলবাবু বললেন, 'কিন্তু আমাদের তীর্থযাত্রার কি হবে, যাওয়া উচিত হবে কি না, কিছু বললেন না তো।'

'নিশ্চয় তীর্থযাত্রা করবেন। কবে থেকে আপনার ছুটি?'

'সামনের শনিবার থেকে।'

'তাহলে আর দেরি করবেন না, টিকিট কিনে ফেলুন। কোনো ভয় নেই, আপনার বাসা বেদখল হবে না, আমি জামিন রইলাম।—আচ্ছা, চলি।'

'অ্যাঁ—তাই নাকি! ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'তার দরকার নেই, আমি এখন থানায় যাব। রাখালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে হবে।'

শনিবার সকালবেলা কমলবাবুর বাসা থেকে পুলিসের পাহারা তুলে নেওয়া হল। কমলবাবু ভুটোকে একটা কেনেলে রেখে এলেন। পুলিস

ছাড়াও অন্য একটি পক্ষ বাসার ওপর নজর রেখেছিল, তারা সব লক্ষ্য করল।

'বিকেলবেলা কমলবাবু তাঁর স্ত্রী মেয়ে এবং পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বাসায় চাবি দিয়ে চলে গেলেন, যাবার পথে থানায় রাখালবাবুকে চাবি দিয়ে বলে গেলেন, খিড়কির দোর ভেজিয়ে রেখে এসেছি। এখন আমার বরাত আর আপনাদের হাতযশ।'

সারা দিন বাড়িটা শূন্য পড়ে রইল।

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু কমলবাবুর বাসার দিকে গেলেন। দুজনের পকেটেই পিস্তল এবং বৈদ্যুতিক টর্চ।

সরজমিন আগে থাকতেই দেখা ছিল, পাশের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দুজনে কমলবাবুর খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। খিড়কির দরজা বন্ধ করে দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। কান পেতে শুনলেন, বাড়ি নিস্তব্ধ।

রাখালবাবু পলকের জন্য দোরের মাথায় টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, ঘোড়ার ক্ষুর যথাস্থানে আছে। তিনি তখন ফিসফিস করে বললেন, 'চলুন ছাদে গিয়ে অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল হবে।'

ব্যোমকেশ তাঁর কানে কানে বলল, না। আমি ছাদে যাচ্ছি, তুমি এই ঘরে লুকিয়ে থাকো। দুজনেই ছাদে গেলে ছাদের দোর এদিক থেকে বন্ধ করা যাবে না, আসামীর সন্দেহ হবে।'

'বেশ আপনি ছাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকুন, আমি দোর বন্ধ করে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ ছাদে উঠে গেলে রাখালবাবু দরজায় হুড়কো লাগিয়ে নেমে এলেন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ঠিক নেই, এমন কি আসামী আজ নাও আসতে পারে। তিনি দোতলার ঘরের ভিতরে ঢুকে দোরের পাশে লুকিয়ে রইলেন।

ছাদের ওপর ব্যোমকেশ এদিক ওদিক ঘুরে জলের চৌবাচ্চা ওপর থেকে দূরের একটা কোণে আলসের পাশে গিয়ে বসল। আকাশে চাঁদ নেই, কেবল তারাগুলো ঝিকমিক করছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বনের মধ্যে ছাগল বা বাছুর বেঁধে মাচায় বসে বাঘের প্রতীক্ষা করার মত। রাত্রি দুটো বাজতে যখন আর দেরি নেই, তখন রাখালবাবুর মন বন্ধ ঘরের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল; আজ আর শিকার আসবে না। ঠিক এই সময় তিনি দোরের বাইরে মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন; মুহূর্তে তাঁর স্নায়ুপেশী শক্ত হয়ে উঠল; তিনি নিঃশব্দে পকেট থেকে পিস্তল বার করলেন।

যে মানুষটি নিঃসাড়ে বাড়িতে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল, তার বাঁ হাতে ছিল একটি ক্যাম্বিসের থলি, আর ডান হাতে ছিল লোহা-বাঁধানো একটি ছড়ি। ছড়ির গায়ে তিন হাত লম্বা মুগার সুতো জড়ানো, মাছ-ধরা ছিপের গায়ে যেমন সুতো জড়ানো থাকে সেই রকম।

লোকটি দোরের মাথার দিকে লাঠি বাড়িয়ে ঘোড়ার ক্ষুরটি নামিয়ে আনল, তারপর মুগার স্থতোর ডগায় সেটি বেঁধে নিয়ে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। দু'টি মানুষ যে বাড়ির দু'জায়গায় ওৎ পেতে আছে, তা সে জানতে পারল না।

ছাদের দরজায় একটু শব্দ শুনে ব্যোমকেশ সতর্ক হয়ে বসল। নক্ষত্রের আলোয় একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল, সোজা ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে আলসের ওপর উঠে ট্যাঙ্কের মাথায় চড়ল। ধাতব শব্দ শোনা গেল। সে ট্যাঙ্কের ঢাকনি খুলে সরিয়ে রাখল, তারপর লাঠির আগায় স্থতো-বাঁধা ঘোড়ার নাল জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

লোকটা যেন আবছা অন্ধকারে বসে ছিপ ফেলে চুনো মাছ ধরছে। ছিপ ডোবাচ্ছে আর তুলছে। মাছগুলি ব্যাগের মধ্যে পুরে আবার ছিপ ফেলছে।

কুড়ি মিনিট পরে লোকটি মাছ ধরা শেষ করে ট্যাঙ্ক থেকে নামল। এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে ছিপ নিয়ে যেই পা বাড়িয়েছে, অমনি তার মুখের ওপর দপ করে টর্চ জ্বলে উঠল, ব্যোমকেশের ব্যঙ্গ-স্বর শোনা গেল, 'অক্ষয় মণ্ডল, কেমন মাছ ধরলে ?"

অক্ষয় মণ্ডলের পরনে খাকি প্যাণ্ট ও হাফ-সার্ট, কালো-মুস্কো চেহারা। সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আস্তে আস্তে থলিটি নামিয়ে ক্ষিপ্রবেগে পকেটে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশের টর্চ গদার মত তার চোয়ালে লাগল, অক্ষয় মণ্ডল ছাদের ওপর চিতিয়ে পড়ল।

রাখালবাবু নিচে থেকে উঠে এসেছিলেন, তিনি অক্ষয় মণ্ডলের বুকের ওপর বসে বললেন, 'ব্যোমকেশদা, এর পকেটে পিস্তল আছে, বের করে নিন।'

ব্যোমকেশ অক্ষয় মণ্ডলের পকেট থেকে পিস্তল বার করে নিজের পকেটে রাখল। রাখালবাবু আসামীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে বললেন, 'অক্ষয় মণ্ডল, হরিহর সিংকে খুন করার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।'

ব্যোমকেশ অক্ষয় মণ্ডলের থলি থেকে কয়েকটা ভিজে লোহার প্যাকেট বার-করে তার ওপর টর্চের আলো ফেলল। 'বাঃ! এই যে, যা ভেবেছিলাম তাই। লোহার মোড়কের মধ্যে চকচকে বিদেশী সোনার বিস্কুট।'

পরদিন সকালবেলা সত্যবতী ব্যোমকেশকে বলল, 'ভাল চাও তো বল, কোথায় রাত কাটালে ?'

ব্যোমকেশ কাতর স্বরে বলল, 'দোহাই ধর্মাবতার, রাখাল সাক্ষী—আমি কোনো কুকার্য করিনি।'

'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। গল্পটা বলবে ?'

'বলব, বলব। কিন্তু আগে আর এক পেয়ালা চা দিতে হবে। এক পেয়ালা চা খেয়ে রাত জাগার গ্লানি কাটেনি।'

সত্যবতী প্রায় এক পেয়ালা কড়া চা এনে ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসল, 'এবার বল, টর্চটা ভাঙলে কি করে ? মারামারি করেছিলে ?'

ব্যোমকেশ বলল, 'মারামারি নয়, শুধু মারা।' চায়ে একটি চুমুক দিয়ে সে বলতে আরম্ভ করল :

'অক্ষয় মণ্ডল সোনার চোরা কারবার করে অনেক টাকা করেছিল। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভদ্র পাড়ায় একটি বাড়ি করেছিল, বাড়ির ছাদ লোহার ডাণ্ডা-ছত্রী দিয়ে এমনভাবে মুড়ে রেখেছিল যে ওদিক দিয়ে বাড়িতে চোর ঢোকার উপায় ছিল না। ছাদটাকে নিরাপদ করা তার বিশেষ দরকার ছিল।

'অক্ষয় মণ্ডলের পেশা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যেসব চোরাই সোনা আসে তাই সংগ্রহ করা এবং সুযোগ মত বাজারে ছাড়া। সে বাড়িতেই সোনা রাখত, কিন্তু লোহার সিন্দুকে নয়। সোনা লুকিয়ে রাখার এক বিচিত্র কৌশল সে বার করেছিল।

'অক্ষয় মণ্ডল বাড়িতে একলা থাকত; তার স্ত্রী আছে কিনা তা এখনো জানা যায় নি। সে পাড়ার লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করত না, কিন্তু পাছে পড়শীরা কিছু সন্দেহ করে, তাই কমল দাস নামে একটি ভদ্রলেককে নিচের তলায় একটি ঘর ভাড়া দিয়েছিল। বাজারে সোনা ছাড়বার জন্যে সে কয়েকজন লোক রেখেছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম হরিহর সিং।

হরিহর সিং বোধহয় অক্ষয় মণ্ডলকে ফাঁকি দিচ্ছিল। একদিন দু'জনের ঝগড়া হল, রাগের মাথায় অক্ষয় মণ্ডল হরিহর সিংকে খুন করল। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হলে তার ভাবনা হল, মড়াটা নিয়ে সে কি করবে। একলা মানুষ, ভদ্র পাড়া থেকে মড়া পাচার করা সহজ নয়। সে স্থির করল, মড়া থাক, বাড়িতে যা সোনা আছে, তাই নিয়ে সে নিজে ডুব মারবে।

কিন্তু সব সোনা সে নিয়ে যেতে পারল না। সোনা ধাতুটা বিলক্ষণ ভারি, লোহার চেয়েও ভারি। তোমরা স্ত্রী-জাতি সারা গায়ে সোনার গয়না বয়ে বেড়াও, কিন্তু সোনার ভার কত বুঝতে পারো না। দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই।

সত্যবতী বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর বল।'

'অক্ষয় মণ্ডল ডুব মারবার কয়েক দিন পরে লাশ বেরুল; পুলিস এল, কিন্তু খুনের কিনারা হল না। অক্ষয় মণ্ডল খুন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। কমলবাবু সারা বাড়িটা দখল করে বসলেন।

'অক্ষয় মণ্ডল নিশ্চয় কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে ছিল, কয়েক মাস চুপচাপ রইল। কিন্তু বাড়িতে যে-সোনা লুকোনো আছে—যেগুলো সে সরাতে পারেনি, সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। কাজটি সহজ নয়। কমলবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে সর্বদা বাড়িতে থাকে, তাছাড়া একটা ভয়ংকর হিংস্র কুকুর আছে। অক্ষয় মণ্ডল ভেবে-চিন্তে এক ফন্দি বার করল।

একটি স্ত্রীলোককে বউ সাজিয়ে এবং একটা পেটোয়া লোককে তার ভাই সাজিয়ে অক্ষয় মণ্ডল কমলবাবুর কাছে পাঠাল। বউকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। অক্ষয় মণ্ডল ফেরারী খুনী হতে পারে, কিন্তু তার বউ তো কোনো অপরাধ করেনি। কমলবাবু কিন্তু শুনলেন না, তাদের হাঁকিয়ে দিলেন। অক্ষয় মণ্ডল তখন বেনামী চিঠি লিখে ভয় দেখাল, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। কমলবাবু নড়লেন না।

অক্ষয় মণ্ডল তখন অন্য রাস্তা ধরল।

আমার বিশ্বাস ব্যাঙ্কের যে সহকর্মীটি কমলবাবুকে তীর্থে যাবার জন্যে ভজাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে অক্ষয় মণ্ডলের যোগাযোগ আছে। দু-চার দিনের জন্যেও যদি কমলবাবুকে সপরিবারে বাড়ি থেকে তফাৎ করা যায়, তাহলেই অক্ষয় মণ্ডলের কার্যসিদ্ধি। কাজটা সে বেশ গুছিয়ে এনেছিল, কিন্তু একটা কারণে কমলবাবুর মনে খটকা লাগল। বাড়ি যদি বেদখল হয়ে যায়! তিনি আমার কাছে পরামর্শ নিতে এলেন।

তার গল্প শুনে আমার সন্দেহ হল বাড়িটার ওপর, আমি বাড়ি দেখতে গেলাম। দেখাই যাক না। অকুস্থলে গেলে অনেক ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গেলাম বাড়িতে। কড়া রোদ ছিল, তাই ছাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। দোতলায় উঠে দেখলাম, দোরের মাথায় ঘোড়ার নাল তিনটে পেরেকের মাঝখানে আলগাভাবে আটকানো রয়েছে। ঘোড়ার নালটা এক নজর দেখলে ঘোড়ার নাল বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু ঠিক যেন ঘোড়ার নাল নয়। আমি ছাতাটা সেইদিকে বাড়িয়ে দিলাম, অমনি ছাতাটা আপনা থেকেই গিয়ে ঘোড়ার নালে জুড়ে গেল।

বুঝলাম, ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম, ঘোড়ার নাল নয়, একটি বেশ শক্তিমান চুম্বক—ছাতার লোহার বাঁট পেয়ে টেনে নিয়েছে। প্রশ্ন করে জানলাম চুম্বকটা অক্ষয় মণ্ডলের। মাথার মধ্যে চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল—কেন? অক্ষয় মণ্ডল চুম্বক নিয়ে কি করে? দোরের মাথায়

টাঙিয়েই বা রেখেছে কেন, যাতে মনে হয় ওটা ঘোড়ার নাল ? মনে পড়ে গেল, পুলিসের খানাতল্লাশে দেরাজের মধ্যে কয়েকটি লোহার মোড়ক পাওয়া গিয়েছিল। রহস্যটা ক্রমশ পরিষ্কার হতে লাগল।

তারপর যখন ঘেরাটোপ লাগানো ছাদে গিয়ে জলের ট্যাঙ্ক দেখলাম, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। চুম্বক যত জোরালোই হোক, সোনাকে টানবার ক্ষমতা তার নেই। তাই সে সোনার বিস্কুট লোহার প্যাকেটে মুড়ে ট্যাঙ্কের জলে ফেলে দেয়। তারপর যেমন যেমন দরকার হয়, ট্যাঙ্কে চুম্বকের ছিপ-ফেলে জল থেকে তুলে আনে। হরিহর সিংকে খুন করে পালাবার সময় সে সমস্ত সোনা নিয়ে যেতে পারেনি। এখন বাকি সোনা উদ্ধার করতে চায়। পালাবার সময় সে ভাবেনি যে ব্যাপারটা পরে এত জটিল হয়ে উঠবে।

যাহোক, সোনার সন্ধান পেলাম ; সমুদ্রের তলায় শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তো থাকে, ট্যাঙ্কের তলায় তেমনি লোহার পাতে মোড়া সোনা আছে। কিন্তু কেবল সোনা উদ্ধার করলেই তো চলবে না, খুনী আসামীকে ধরতে হবে। আমি কমলবাবুকে বললাম, আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। তারপর রাখালের সঙ্গে পরামর্শ করে ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করলাম।

কাল সকালে কমলবাবুরা তীর্থযাত্রা করলেন। বাড়ির ওপর অক্ষয় মণ্ডল নজর রেখেছিল, সে জানতে পারল, রাস্তা সাফ।

কাল সন্ধ্যের পর রাখাল আর আমি বাড়িতে গিয়ে আড্ডা গাড়লাম। কালই যে অক্ষয় মণ্ডল আসবে এতটা আশা করিনি, তবু পাহারা দিতে হবে। বলা তো যায় না। রাত্রি দুটোর সময় শিকার ফাঁদে পা দিল। তারপর আর কি ! টর্চের একটি ঘায়ে ধরাশায়ী।'

সত্যবতী ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কত সোনা পাওয়া গেল ?'

সিগারেট ধরিয়ে ব্যোমকেশ বলল, 'সাতান্নটি লোহার মোড়ক, প্রত্যেকটি মোড়কের মধ্যে দু'টি করে সোনার বিস্কুট, প্রত্যেকটি বিস্কুটের ওজন পঞ্চাশ গ্রাম। কত দাম হয় হিসেব করে দেখ।'

সত্যবতী কেবল একটি নিশ্বাস ফেলল।

একপো দুধ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ব্যবস্থাটা লতিকাই করল প্রথমে। স্বামীর জন্যে একপো দুধ রোজ ক'রে বসল। দেড়পো দুধ খুকীর জন্যে রাখতেই হয়। দেড় বছরের শিশুকে খালি সাগু বার্লি খাইয়ে তো আর রাখা যায় না, তার থেকেও দু'চার চামচ চায়ে ব্যয় হয়। সস্তা মিল্ক পাউডার দিয়ে চা খেতে খেতে সকাল সন্ধ্যায় দু'কাপ চা মাঝে মাঝে একেবারেই বিস্বাদ হয়ে আসে বিনোদের। একদিন গোয়ালা দুধ দিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে সে বলল, 'এক চামচ দুধ দিয়ে আজ চা কর দেখি।'

দুধ দেওয়ার বদলে লতিকা মুখ ঝামটা দিল,—'তোমার যেমন কথা! দুধ পাব কোথায়? কত যেন সেরে সেরে দুধ রাখা হয়! খুকীর জন্যে এই তো এক ফোঁটা দুধ, তাও যদি তোমার চায়ে দেই, তা হলে ও খায় কি!'

বিনোদ বলল, 'থাক থাক, আর চেঁচিয়ো না।'

দিন দুই চুপচাপ কাটল। লতিকা দেখলো স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। খাটতে খাটতে লোকটির চেহারা একেবারে হাড্ডী সার হয়ে গেছে। এই তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর মোটে বয়স। এরই মধ্যে বিনোদের দুগাল ভেঙেছে, চোয়াল জেগেছে, কেমন যেন বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে। লোকটির দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিন দিনের দিন ভোর বেলায় হাতল ভাঙা চায়ের কাপটি ঠিক অন্যদিনের মতই স্বামীর সামনে এনে রাখল লতিকা। বিনোদ দেখে অবাক। চায়ের কাপে চা নয়, কানায় কানায় ভর্তি দুধ!

বিনোদ বলল, 'এ আবার কি! খুকীর দুধ দিলে না কি সবটুকু!'

লতিকা বলল, 'না না, তুমি খাও। খুকীর দুধ দেব কেন, তোমার জন্যে আলাদা ক'রে রেখেছি। যা ছিরি হয়েছে তোমার, সপ্তাখানেক কি পনের দিন খেয়ে দেখ। চেহারাটা যদি একটু ফেরে।'

এবার আর সামনে এক কাপ দুধ দেখল না বিনোদ, দেখল দুধসাগর। স্ত্রীর গোপন হৃদয়ের প্রেম-সাগরের প্রতিরূপ। কবে যে সে লতিকাকে বিয়ে করেছিল, তা ভুলেই যেতে বসেছিল বিনোদ। আজ ফের মনে পড়ল। লতিকার চোয়াল-জাগা ফেকাসে মুখ, বার বছর আগেকার কুঙ্কুম-চন্দনে সাজানো আর একটি মুখের কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। বিবর্ণ

কোটরগত দু'টি চোখ দেখে মনে পড়ল শুভদৃষ্টির সময়কার একটি ষোড়শী কমলাক্ষীকে।

বিনোদ বলল, 'কিন্তু খরচ বেশি পড়ে যাবে যে।'

লতিকা বলল, 'যায় যাবে। তুমি রোজগার কর, তোমার জন্যে সংসারের খরচ যদি একটু বাড়ে, বাড়লই বা।'

আর কিছু না ব'লে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ।

একটু দূরে দরজার কাছে মেঝের ওপর মাদুর পেতে স্কুলের পড়া পড়ছে সুনীল। বিনোদের ন'বছরের ছেলে। ওর পরে আর খুকীর আগে আরো যে তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তারা কেউ নেই; সুনীল পাড়ার হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে ওর হাফ্-ফ্রী শিপ যোগাড় করেছে বিনোদ। বইপত্রও সব কিনে দিয়েছে।

ইংরেজী গ্রামার পড়তে পড়তে বাপের দুধ খাওয়ার দিকে সে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে, ফের গলা ছেড়ে আরো জোরে জোরে পড়তে লাগল, **Lion—Lioness, Lion—Lioness, Fox—Vixen, Fox—Vixen**

বিনোদ একটুকাল ছেলের জেণ্ডার-পাঠ কান পেতে শুনল, তারপর বলল, 'তুই একটু খাবি নাকি দুধ, ও সুনীল।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'না, তুমি খাও। আমার দুধ লাগবে না। **Fox—Vixen, Fox—Vixen.**'

বিনোদের লজ্জা দেখে লতিকা বলল, 'তুমি খাও, ওর জন্যে আবার আর একদিন রেখে দেব। পরীক্ষার সময় আমার সোনার জন্যে রোজ দুধ রাখব।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আমার জন্যে কারো দুধ রাখতে হবে না। আমি দুধ খাইনে। **Dog—Bitch, Dog—Bitch.**'

বিনোদ এবার কেন যেন ধমক দিয়ে উঠল, 'ওই কয়েকটা কথা মুখস্থ করতে তোর কতক্ষণ লাগবে? কাল রাত্রেও তো ওই gender-ই পড়েছিস।'

বিনোদের ছোট ভাই বিজন ওঠে একটু দেরীতে। হাতমুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকল; 'কি বউদি, চা-টা হয়ে গেল নাকি তোমাদের?'

বি. এ. পাস ক'রে বিজন বছর দুই যাবৎ বেকার রয়েছে। প্রথম প্রথম ভারি ছটফট করতো। এখন গা-সওয়া হয়েছে। খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত ভাবই এসেছে আজকাল।

বিজনের কথার জবাবে লতিকা বলল, 'না ভাই, তোমাকে ফেলে কি চা আমরা খাই, যে আজ খাব?'

বিজন হেসে বলল, 'দাদা বুঝি তেষ্টার চোটে না থাকতে পেরে খালি কাপে চুমুক দিচ্ছে! দাদাকে এক কাপ চা ক'রে দিলেই পার!'

বিনোদ আর লতিকা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। বিজন কি জেনে শুনে ব্যঙ্গ করছে! কিন্তু ও তো তেমন ছেলে নয়!

বিনোদ লজ্জিত হয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, 'চা নয় বিজু, দুধ খেলাম এক কাপ। তোর বউদি রেখে দিয়েছিল।'

বিজু লতিকার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল, 'ও তাই বল, চুরি ক'রে ক'রে দাদাকে খাওয়ানো হচ্ছে?'

বিজন একটু ঠাট্টা-তামাসা ভালোবাসে। তবু অভাবের সংসার ব'লে ঠাট্টাটা বিনোদ আর লতিকার কানে যেন একটু কেমন শোনাল। দু'জনের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল।

বিনোদ বলল, 'ওকে এককাপ দুধ কাল দিয়ো।'

লতিকা বলল, 'দেব।'

বিজন মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'আচ্ছা, তোমাদের কি হয়েছে বউদি, তোমরা কি ঠাট্টা-তামাসাও বোঝ না আজকাল? দুধ কি আমি কোনদিন খাই, যে খাব? দুধ তোমাদের কাছে কে চাইছে শুনি? চা দেবে তো দাও।'

একটু পরে কেটলি থেকে দু'টি কাপে যখন চা ঢালতে যাচ্ছিল লতিকা, বিজন হঠাৎ বলল, 'দুধের কাপটা ভালো ক'রে ধুয়ে দাও বউদি। চায়ের কাপে দুধের গন্ধ আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে।'

লতিকা কোন কথা না ব'লে দেওরের দিকে একটু তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ধুয়েই-দিয়েছি ঠাকুরপো। তোমার দাদার এঁটো কাপ তোমাকে দিইনি।'

পরের দিন লতিকা একটু আড়ালে এনে দুধের কাপটি দিল স্বামীকে। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ।

ঘরের মধ্যে সুনীল আজ আর ইংরেজী গ্রামার পড়ছে না। স্বাস্থ্যপাঠ মুখস্থ করছে, 'দুগ্ধ শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।' কে জানে ইচ্ছা ক'রেই এই কথাটা পড়ছে কি না। বিজন আজ আর বিনোদের ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতে করতে বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। বিনোদ যাতে অপ্রস্তুত না হয়ে পড়ে, কে জানে ইচ্ছা ক'রেই সেইজন্যে সে দাদার সামনে না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কিনা। এমন আস্তে আস্তে দুধেয় কাপটি শেষ করলো বিনোদ, যেন চুমুকের শব্দ কারো কানে না যায়।

মাত্র দিনকয়েক এই সংকোচটুকু রইল, কিন্তু সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই সমস্ত লজ্জা সংকোচ ভেঙে গেল বিনোদের। এখন সে ছেলে, ভাই, স্ত্রী, সকলের সামনেই দুধ খায়। দিতে একটু দেরি হ'লে জোর গলায় হাঁক দেয়, 'কই গো, দিয়ে যাও আমার দুধ, আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে।'

লতিকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'আনছি গো আনছি। দুধ না হয় ঘুরে এসেই খেতে, তোমার দুধ আর কেউ নিয়ে যাবে না!'

পটলডাঙা স্ট্রীটে বাণী পাবলিশিং-এ প্রুফ রীডারের কাজ করে বিনোদ। সব সময় কাজ থাকে না। মাঝে মাঝে দশ-পনের টাকার টিউশনি পায়। ইনসিওরেন্সের একটা এজেন্সী আছে। পরিচিত বন্ধুদের পিছনে হাঁটাহাঁটি ক'রে স্যাণ্ডাল ক্ষয় ক'রে ফেলে। তবু বছরে তিন-চার হাজারের বেশি দিতে পারে না।

কিন্তু বিনোদ দাস বাইরে যতই অকিঞ্চন হোক, ইন্টালীর এই অনরেট সেকেন্ড লেনের ৭।৩।২-এর একতলা বাড়ির কোণের দিকের ঘরখানায় সে সম্রাট্, সংসারের সর্বময় কর্তা। এই সংসারের জন্যে সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিচ্ছে, আর এক কাপ দুধে তার অধিকার নেই! নিজের রোজগারের পয়সায় সে নিজে দুধ খাবে, তাতে অত লজ্জা কিসের?

বিনোদ দুধ খেতে লাগল।

দু' সপ্তাহ কাটল, তিন সপ্তাহ কাটল, লতিকা ভাবল বিনোদ বুঝি এবার নিজেই না করবে,—বলবে, 'আর দিয়ো না দুধ, এবার বন্ধ করে দাও।'

কিন্তু বিনোদের যেন সেদিকে মোটে খেয়ালই নেই।

এক মাস বাদে গয়লা সাড়ে-সাত টাকা বেশি বিল করল দুধের। লতিকা তো ভাবনায় অস্থির—কোন্ দিক থেকে ক' টাকা কেটে এই সাড়ে-সাত টাকা পুরিয়ে দেবে। গোয়ালাকে দু'তিন দিন বাদে টাকা নিতে আসবার অনুরোধ ক'রে লতিকা বলল, 'এক পো ক'রে যে বেশি দুধ নিয়েছি, এ মাস থেকে তা আর দিতে হবে না। তুমি আগের দেড় পো ক'রেই দিও!'

ঘরের মধ্যে প্রুফ দেখছিল বিনোদ, এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে এসে নিজেই বলল, 'না হে, এ মাসও এক পো ক'রে বেশিই দাও, দুধটা বেশ ভালোই তোমার। শরীরটা যেন একটু শুধরেছে ব'লে মনে হচ্ছে। দেখি আর এক মাস খেয়ে।'

গোয়ালা চলে গেলে লতিকা বলল, 'আচ্ছা, তোমার আক্কেলখানা কি? তুমি যে দুধের খরচ এমাসেও বাড়িয়ে দিলে, টাকা দেব কোত্থেকে?' বিনোদ ভারি অপমানিত বোধ ক'রে স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলল, 'টাকা তুমি কি দাও, যে টাকার ভাবনা ভাবছ? টাকা যে দেয়, সে দেবে। সারাদিন তোমাদের জন্যে খেটে মরছি আর এক ফোঁটা দুধ জুটবে না আমার কপালে?'

লতিকা বলল, 'জুটবে না কেন। একপো কেন, আমি বলি এক সের ক'রে দুধ রাখ তুমি। সত্তর-পঁচাত্তর টাকা তো সব দিয়ে রোজগার কর, তা নিজেই তুমি খাও—দুধ খাও, ঘি খাও, মাংস খাও, পোলাও খাও, সংসারের আর মানুষের দিকে তোমার চেয়ে দরকার কি।'

বিনোদ চটে গিয়ে বলল, 'খাবই তো, আমার টাকা-পয়সায় আমি খাব, আমি প'রব, তাতে তোর কি ?'

সকালবেলায় দুধের কাপটি ফিরিয়ে দিল বিনোদ। কিন্তু রাত্রে খাওয়ার সময় যখন বাটিতে ক'রে ফের খানিকটা গরম দুধ স্বামীর সামনে ধ'রে দিল লতিকা, বিনোদ আর ফিরিয়ে দিতে পারল না। সারাদিনভর আজ তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিল, কি যেন খায়নি, কি যেন পায়নি, কি যেন বাদ গেছে জীবন থেকে। সারাদিনের খাটুনির শেষে অনেক বঞ্চনা, অনেক আশা-ভঙ্গের পর রাত দশটার সময় বাসায় ফিরে ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে বাজে আটার শুকনো রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে শেষে যখন ছোট একটু বাটিতে সাদা তরল পানীয়টুকু দেখতে পেল বিনোদ, ওর মন ব'লে উঠল, —এই সেই হারানো বস্তু, এই সেই পরম বস্তু।

বাটিটুকু ছোট হ'লে কি হবে, আজকের দুধটুকু বেশ ঘন আওটা, ওপরে একটু সরও পড়েছে। সরটুকু চেখে চেখে খেল বিনোদ। তারপর বলল, 'আরো দু'খানা রুটি দাও তো ছিঁড়ে, দুধের সঙ্গে খাই। পেটটা যেন কিছুতেই ভরছিল না। কাল থেকে দুধটা রাত্রেই দিয়ো।'

লতিকা হাসি চেপে বলল, 'তাই দেব।'

কিন্তু আশ্চর্য, পরদিন রাত্রে বিনোদ দেখে পাতের ওপর শুধু রুটির রাশই রয়েছে, পাতের কাছে দুধের বাটি নেই।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'দুধ কি হ'ল ?'

লতিকা বলল, 'সুনীলকে দিয়েছি। আজ তো একবেলার জন্যেও আর মাছ আসেনি। খাওয়া নিয়ে বড়ই মাতলামি করছিল। রোজ দুধ চায়, আজ দিলাম ও'কে।' বিনোদ গম্ভীর ভাবে বলল—'বেশ করেছ'।

দিনকয়েক বাদে ফের একদিন বিনোদের পাতের কাছে দুধের বাটির অভাব হ'ল। সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই লতিকা বলল, 'আজ কিন্তু তোমার দুধটুকু ঠাকুরপোকে দিয়েছি। চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিল। ফিরে এল দুপুরের পর। খেতে ব'সে ভাত আর পারেনা খেতে। রোজই তো ওই চিংড়ির কুচো আর পুঁই চচ্চড়ি। একটু আমসত্ত্ব ভিজিয়ে আজ দিলাম ওকে ওই দুধটুকু। বললে বিশ্বাস যাবে না, তাই দিয়ে ঠাকুরপো আধ থালা ভাত খেয়ে উঠল।'

বিনোদ বলল, 'বেশ করেছো, কিন্তু চাকরির কথা কি বলল। অত যে সুপারিশ চিঠি-ফিটি যোগাড় ক'রে পাঠালাম, কি হ'ল তার ?'

লতিকা বলল, 'হয়নি। ব'লে দিয়েছে খালি নেই।'

বিনোদ বলে উঠল, 'ওর জন্যে খালি আর হবেও না, দুধই খাওয়াও আর আমসত্ত্বই খাওয়াও, জীবনে ওর চাকরি হবে না ব'লে দিলাম।' বেশির ভাগ রুটি-তরকারি ফেলে রেখে বিনোদ উঠে দাঁড়াল। পরদিন থেকে ফের দুধ পেতে লাগল বিনোদ। মাঝখানে আবার দু'একদিন বাদ গেল।

লতিকা বলল, 'ভারি দুষ্টু হয়েছে সুনীল, ভারি ছোঁচা হয়েছে আজকাল। টিফিন থেকে এসে রান্নাঘরে ঢুকে কড়ার মধ্যে কাপ ডুবিয়ে দুধ চুরি ক'রে খায়। ওকে নিয়ে আর পারা গেলনা।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ।'

লতিকা বলল, 'আমি ক'দিন ধরেই দেখছিলাম। আজ কড়া শাসন ক'রে দিয়েছি। আস্ত একখানা চেলাকাঠ ভেঙেছি পিঠে। যদি প্রাণের ভয় থাকে, জীবনে আর দুধের কড়ার কাছে যাবে না।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ, ছেলেবেলা থেকেই এত লোভ ভালো না।'

আরও কাটল দিন কয়েক। তারপর ফের একদিন পাতের কাছে দুধের বাটি দেখতে না পেয়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'আজও কি সুনীল দুধ চুরি ক'রে খেয়েছে নাকি? ওর সাহস তো কম নয়, অত মার খাওয়ার পরেও—'

লতিকা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, 'না, আজ আর ও চুরি করেনি। পাশের বাড়ির সাদা বেড়ালটা এসে খেয়ে গেছে।'

বিনোদ রাগ ক'রে উঠল, 'পাশের বাড়ির বেড়ালে এসে দুধ খেয়ে গেল আর তুমি হাসছ! এত দামী দুধ। ঢেকে-টেকে সাবধান ক'রে রাখতে পার না! চার আনা ক'রে এক পো দুধ। সোজা কথা! গেল তো কতগুলি পরের বাড়ির বেড়ালের পেটে। পয়সা তো আর নিজে কামাই কর না। কি বুঝবে তার মর্ম!'

লতিকা বলল, 'নিজে কামাই না করলেও বুঝি। ভয় নেই। সত্যিই আর পরের বেড়ালে কড়া থেকে দুধ খেয়ে যায় নি। আমি অত অসাবধান না। তোমার নিজের বেড়ালেই খেয়েছে দুধ। হ'ল তো!'

লতিকা ফের একটু হাসল।

বিনোদ এবারও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, 'রাত দুপুরে কি যে মস্করা কর, ভালো লাগে না। কি হয়েছে খুলেই বল না বিষয়টা।'

লতিকা এবার বিষয়টা খুলেই বলল। ক'দিন ধ'রেই তার অম্বলের দোষটা বেড়েছে। যা খায় তাই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। টক টক ঢেঁকুর ওঠে, সারা দিন অস্থির-অস্থির লাগে। আজ দুপুরের পর একেবারে বমিই হয়ে গেল, যা খেয়েছিল, কিছুই রইল না পেটে। বিকেল বেলায় খিদেয় আর বাঁচে না। কি খায়, কি খায়। অথচ যা মুখে দেবে তাতেই অম্বল হবে। অবস্থা দেখে দোতলায় মুখুয্যেদের মাসীমা বললেন, 'এক কাজ কর বউমা, ঘরে তো তোমাদের দুধ আছে। তার মধ্যে এক মুঠ খই ভিজিয়ে খাও। তাতে অম্বল হবে না। দেহটাও ভালো থাকবে।'

লতিকা তাঁর পরামর্শই নিল। তাই কি সুস্থভাবে খাওয়ার জো আছে। স্কুল থেকে সুনীল এসে হাজির। 'মা, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কি খাচ্ছ?'

'মধু খাচ্ছি, নে।'

তার হাতেও দিতে হ'ল এক দলা।

খাওয়া শেষ ক'রে থালার ওপর সশব্দে গ্লাসটা তুলে রেখে বিনোদ বলল, 'তা খেয়েছ খেয়েছ, তার অত ভণিতার কি ছিল! বেড়াল, অম্বল, কত কি। বললেই পারতে দুধ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই খেয়েছি।'

লতিকা ভেবেছিল তার দুধ খাওয়ার কথা শুনে স্বামী একটু হাসবে, হয়ত একটু ঠাট্টা পরিহাস করবে। কিন্তু স্বামীর মুখ দেখে, মূর্তি দেখে সে প্রথমে খানিকটা অবাক হ'য়ে থেকে অতিমাত্রায় সবাক হ'য়ে উঠল।

'তোমার ধারণা আমি সাধ ক'রে খেয়েছি, ইচ্ছা ক'রে খেয়েছি।'

বিনোদ বলল, 'না, ইচ্ছা ক'রে খাবে কেন। পাড়ার আর কেউ এসে তোমার গলায় ঢেলে দিয়ে গেছে।'

লতিকা বলল, 'খেয়েছি তো বেশ করেছি। তুমি তিরিশ দিন খেতে পার, আর আমি একদিনও পারিনে।'

বিনোদ আঁচাতে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'আসলে সেই হচ্ছে কথা। আমি যে একটু ক'রে দুধ খাই, তা তোমার প্রাণে সয় না, তা তুমি দু'চোখে দেখতে পার না। সেই হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মর।'

লতিকা বলল, 'তোমার দুধ খাওয়া দেখে আমি জ্বলেপুড়ে মরি! মরি তো বেশ করি। বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করে না রোজ রোজ সকলের সামনে দুধ খেতে! একদিন দুধ কম পড়লে তাই নিয়ে বাড়ি মাথায় করতে!'

এঁটো হাতেই বিনোদ রুখে এল, 'লজ্জা করবে কেন রে হারামজাদী, আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সায় খাই—নিজে খাই আমি! লজ্জা তোদের করা উচিত।'

পাশের ঘর থেকে বিজন এল বেরিয়ে, 'কি, হয়েছে কি? রাত-দুপুরে কি শুরু করেছ তোমরা? কি নিয়ে ঝগড়া?'

লতিকা বলল, 'ঝগড়া কি নিয়ে শুনবে! ক্ষিদেয় না থাকতে পেরে আমি আজ দুধটুকু খেয়ে ফেলেছি।'

বিজন বলল, 'ছি ছি ছি, তোমরা হ'লে কি বউদি!'

গোলমালে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সুনীলও উঠে দাঁড়াল। একটু কান পেতে সকলের কথাবার্তা শুনেই সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে গিয়ে বিজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস ক'রে বলল, 'জান কাকু, সেদিন একটু দুধ খেয়েছিলাম ব'লে আমাকে কি মারটাই না মারলে। আজ নিজে চুরি ক'রে খেয়েছে, আজ নিজে মার খাচ্ছে। বুঝুক মজা।'

বিজন বলল, 'ছিঃ, ওকথা বলে না কাকু। যাঁও তুমি ঘুমোও গিয়ে।'

সুনীল খানিক বাদেই ঘুমোল বটে, কিন্তু বিনোদ আর লতিকা সারা রাতের মধ্যে চোখ বুজল না। এক ফোঁটা দুধের জন্যে এত কেলেঙ্কারী

ছিল ভাগ্যে ! লতিকা বার বার নানা সুরে নানা স্বরগ্রামে এই কথাই বলতে লাগল। সংসারে এসে কোন্ সাধটা তার মিটেছে, শাড়ি গয়নার কোন্ সুখটা করেছে। সুখ তো ভালো—সারাদিন যদি সে না খেয়েও থাকে, কেউ আহা বলবার নেই, কেউ জিজ্ঞেস করবার নেই। লতিকা সারা রাত ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল আর বিলাপ করতে লাগল। বিনোদ বারকয়েক বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, 'আঃ, জ্বালাতন ক'রে ছাড়লে, রাত্রে কি একটু আমাকে ঘুমুতেও দেবে না ? কাল তো ভোরে উঠে আমাকে ফের কাজে বেরোতে হবে।'

ধমক খেয়ে লতিকার কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেল।

বিনোদ এবার স্ত্রীকে একটু কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল, বলল, 'সামান্য দুধের জন্যে—'

লতিকা বলল, 'হ্যাঁ, সামান্য দুধের জন্যে তুমি আমাকে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিলে। আমি তো মরে গেলেও আর দুধ কোন দিন মুখে দেব না।' অনেক সাধ্য সাধনায় স্ত্রীকে শান্ত করল বিনোদ। শেষ রাত্রে দেখা গেল কোলের মেয়েকে বাঁ দিকে সরিয়ে রেখে লতিকা বিনোদের কোলের কাছে এসে ঘুমিয়েছে।

পরদিন ভোরে গোয়ালা দুধ দিয়ে গেল। লতিকা তাড়াতাড়ি জ্বাল দিয়ে নিয়ে এল দুধ। কাপে ঢেলে বিনোদের সামনে এগিয়ে দিল। বিনোদ বলল, 'এ আবার কি !'

লতিকা বলল, 'এখনই খাও, সারাদিনভর এ দুধ আমি রাখতে পারব না। কে কখন এসে মুখ দেবে তার ঠিক কি।'

বিনোদ আর কিছু না ব'লে বাঁ হাতখানা আলগোছে স্ত্রীর পিঠের ওপর রেখে, মৃদু হেসে দুধের কাপটি তার মুখের সামনে তুলে ধরল।

লতিকা হেসে বলল, 'হয়েছে, থাক।'

'কি বউদি, চায়ের কদ্দুর।'

ব'লে বিজন ঘরে ঢুকেই থমকে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিল, লতিকা দুধের কাপ হাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'পালাচ্ছ কেন ঠাকুরপো, নাও, দুধটুকু খাও তুমি আজ। আহা কি চেহারাখানাই করেছ। নাও দুধটুকু।'

বিজন বলল, 'তোমার চেহারাখানাই বা এমন কোন বীরাঙ্গনার। তুমিই খাও বউদি।'

লতিকা বলল, 'তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে, ঠাকুরপো।'

বিজন আর কোন কথা না ব'লে, দুধের কাপটি হাতে নিল।

পুবদিকের বারান্দায় সুনীল মাদুর বিছিয়ে বইপত্র নিয়ে বসেছে। আর আড়চোখে তাকাচ্ছে ঘরের দিকে। দেখছে বাবা মা কাকার অদ্ভুত কাণ্ড। সুনীল একা নয়। তার কাছে এসে বসেছে পাশের বস্তীর

ফটিক। সে তাদের ক্লাসেই পড়ে। কিন্তু সুনীলের চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। সব বই কিনে পড়তে পারে না। শুধু যে নোটবইগুলিই তার নেই তা নয়, মূল ইংরেজী বইখানা পুরনো কিনেছিল ব'লে, একটা গল্পের খানতিনেক পাতাই তার মধ্যে নেই, বোধ হয় আগের মালিক নকল করবার জন্যে ছিঁড়ে নিয়েছিল। ফটিক পেনসিল দিয়ে নিজের খাতায় গল্পের সেই ছিঁড়ে যাওয়া অংশটা লিখে নিচ্ছিল।

বিজন বারান্দায় নেমে সুনীলকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিল। তারপর দুধের কাপটি তার সামনে ধ'রে বলল, 'নে সুনীল।'

সুনীল বলল, 'তুমি খাও কাকা, তুমি তো কোন দিন খাও না।'

বিজন বলল, 'আরে তুই খা। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

সুনীল আর কোন কথা না ব'লে কাপটি নিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়। ফটিক মাথা নিচু ক'রে পড়া টুকছে। কালো রোগা চেহারা। ফির-ফির করছে হাড়গুলো। পিঠের দুটো হাড় গরুড় পাখীর দুই ডানার মত উঁচু হয়ে রয়েছে। দেখে দেখে সুনীল বলল, 'এই ফটিক, শোন। লেখা পরে টুকিস, দুধের কাপটা ধরতো।'

ফটিক মুখ তুলে লজ্জিত ভাবে বলল, 'না ভাই, তুই খা।'

সুনীল বলল, 'আরে দূর পাগল। আমি তো রোজই খাই, আজ তুই নে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

ঐশ্বরিক

সুবোধ ঘোষ

তাঁর নাম সাধু রামানন্দ।

কানপুর থেকে আগে চিঠি লিখে নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ছোট কাকা: সাধু রামানন্দ এই একমাস এখানে ছিলেন। এইবার পাটনা যাবেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছি, যেন পাটনাতে তোমাদের ওখানে গিয়ে তিনি একবার পায়ের ধুলো দেন আর অন্তত একটা সপ্তাহ তোমাদের ওখানে বিরাজ করেন। আশা করি তোমাদের ওখানে তাঁর সেবা-যত্নের আর ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন ত্রুটি হবে না।

পাটনাতে এসেছেন সাধু রামানন্দ। এবং একটা সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে, এখনও তিনি নিরঞ্জনের এই বাড়িতেই আছেন। আরও যে কতদিন

এখানেই বিরাজ করবেন সাধু রামানন্দ, সেটা তিনিই জানেন। শিগগির যে চলে যাবেন, এমন কোন লক্ষণও তাঁর কথার বা আচরণে দেখা যায় না।

ছোটকাকা এত আগ্রহ ক'রে আর অনুরোধ ক'রে চিঠি দিয়েছেন বলেই নিরঞ্জন চুপ ক'রে আছে ; তা না হলে সাধু রামানন্দকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস ক'রে বসতো নিরঞ্জন, আর কতদিন এখানে বিরাজ করবেন সাধুজী ? কবে যাবেন ?

বুঝতে পারা যায় আর সাধু রামানন্দ নিজেও বলেছেন, কানপুরের ছোট কাকার বাড়িতে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা আর খুব সেবা-যত্ন পেয়েছেন সাধুজী। এখানে নিরঞ্জনের এই বাড়িতে সাধুজীর সেবা-যত্নের অবশ্য কোন ত্রুটি হচ্ছে না, কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন বাড়াবাড়ি নেই। ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন ব্যাপার নেই বললেও চলে, যদিও অভক্তি বা অশ্রদ্ধারও কোন ব্যাপার নেই।

নিরঞ্জনের পাটনার বাড়ির পিছনের বাগানে বারান্দা-দেওয়া ছোট একটা ঘর আছে। পাকা ঘর। রঙীন সিমেণ্টের মেজে। এই রঙীন সিমেণ্টের চকচকে মেজের একদিকে সাধু রামানন্দের কম্বল পাতা আছে। একটা ঝোলা আছে। কমণ্ডুল আছে। এক জোড়া খড়ম আছে। কম্বলের উপর মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন সাধু রামানন্দ। তখন ঘরের ভিতরের আর বারান্দার ভিড়ও একেবারে নীরব হয়ে সাধুজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই ভিড়ের মধ্যে নিরঞ্জনকে কোনদিন দেখা যায় নি। নিরঞ্জনের বাড়ির কোন মানুষ এই ভক্ত-জনতার ভিতর এসে দাঁড়ায় না, বসে না, হাতজোড় ক'রে তাকিয়ে থাকে না।

অথচ নিরঞ্জনের বাড়িতে লোকজনের অভাব নেই। নিরঞ্জন আছে, নিরঞ্জনের স্ত্রী আছে, নিরঞ্জনের তিন বোন আছে, বড়দার যে দুই ছেলে কলেজে পড়ে, তারাও আছে। বড় বোন রাণুর বরও এখন এখানে আছে। এরা সবাই সাধু রামানন্দকে একবার দেখে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু দেখা, প্রণাম করেনি কেউ, হাত পেতে কোন আশীর্বাদী ফুলও চায় নি।

কিন্তু কোন তুচ্ছতার বা ঠাট্টার হাসিও হাসেনি কেউ। কানপুরে অনেক বড় বড় লোকের বাড়িতে অনেক ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়েছেন এক সাধু, সে-সাধু দেখতে কেমন, শুধু এই কৌতূহলটুকুর জন্যই এবাড়ির মানুষেরা সাধুজীকে শুধু চোখে দেখেছে, আর চলে গিয়েছে।

কিন্তু সাধুজীর অসুবিধেও হতে দেয় নি নিরঞ্জন। বাইরের যারা আসছে আর ভিড় করছে—সাধুজীর ধ্যান দেখছে, উপদেশ শুনছে—তারা আসুক। দারোয়ানকে বলাই আছে, সাধুজীকে দেখবার জন্য কোন ভক্ত মানুষ এলেই যেন গেট খুলে দেওয়া হয়। রোজই সাধুজীর কিছু ফুল দরকার, কারণ বহু প্রার্থীকে আশীর্বাদ করতে হয়। নিরঞ্জন তার চাকর

কৈলাসকে বলে দিয়েছে, রোজ সকাল বেলা যেন এক ঠোঙা ফুল সাধুজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সাধুজীর দু'বেলা স্নানের জল কৈলাসই কুয়ো থেকে তুলে দেয়। বাড়ির রান্নার কাজ করে যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠ পাঁড়ে, তাকেও বলা আছে, সাধুজীর দু'বেলার ভোজন আর জলখাবার বাগানের ঐ ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। চা খাওয়া অভ্যাস আছে সাধুজীর। বৈকুণ্ঠ পাঁড়ে সকাল-সন্ধ্যায় সাধুজীর ঘরে চা পৌঁছে দিয়ে আসে।

সাধু রামানন্দের বয়স বেশি নয়; তবু মুখভরা দাড়ি, কাঁচা দাড়ি। জটা নেই, কিন্তু চুল খুব লম্বা। চুলের গোছা মাথার উপরে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। পরণে গেরুয়া রঙে ছোপানো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় তামার চাকতির একটা মালা—সে মালার সঙ্গে ছোট একটা সাদা শঙ্খ ঝুলছে।

নিরঞ্জন এক-একদিন রাণুর বর হিতেনের সঙ্গে গল্প করে—সাধুজীর আধ্যাত্মিক পসার তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি।

হিতেন হাসে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

নিরঞ্জন—এ তো বড় চমৎকার প্রফেসন। পনের দিনের মধ্যেই মক্কেলের এত ভিড়। আমার চেম্বারে তো এই দশ বছরের মধ্যে একসঙ্গে দশজনের বেশি মানুষেরও ভিড় হয়নি।

হিতেন—সাধুজী ভক্তদের কাছ থেকে টাকা পয়সাও নিচ্ছেন নাকি?

—নিচ্ছেন বই কি। আমারই মক্কেল শ্যামলাল আজ এক'শো টাকার একটি নোট দিয়ে সাধুজীকে প্রণাম করেছে।

হিতেন—তাহলে আমি আর এত কষ্ট ক'রে আর মড়া চিরে-চিরে ডাক্তারী পড়ি কেন? এরকম একটা স্পিরিচুয়্যাল প্র্যাকটিস শুরু ক'রে দিলেই তো পারি।

নিরঞ্জন হাসে—যদি সাহস করে শুরু করে দিতে পার তবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে হিতেন।

চাকর কৈলাস বলে—না বাবু, সকলেই যে সাধুজীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করে, তা নয়। কেউ কেউ এক আনা দু' আনা দিয়েও প্রণাম করে। এমন কি, এক পয়সাও প্রণামী দিতে পারে না, এমন লোকও আসে।

হিতেন হাসে—তার কাছ থেকে বোধহয় হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেন সাধুজী।

কৈলাস—আজ্ঞে?

হিতেন—নগদ না হলে, ধারেই পায়ের ধুলো বিক্রী করেন তোমাদের সাধুজী।

কৈলাস—না, জামাইবাবু। ঐ তো সত্যবাবুর বউ রোজই আসছেন আর প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। কোনদিন একটা পয়সাও দেননি সত্যবাবুর বউ।

হিতেন—কেন ?

কৈলাস—পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই।

দুই

ঠিকই, সাধু রামানন্দ বোধহয় মনে মনে রোজ বিরক্ত হয়েছেন। এক মহিলা ভক্ত রোজই আসছেন। দু'হাত জোড় ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকছেন। সব ভক্ত চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ বসে থাকেন এই মহিলা।

সাধু রামানন্দের ধ্যানস্থ চোখ দুটোও মাঝে মাঝে যেন অস্বস্তি সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

সাধু রামানন্দ বিরক্ত হয়ে কথা বলেন—তুমি তো রোজই আস, কিন্তু একেবারে খালি হাতে আস কেন ?

—আমার এক পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই, ঠাকুর।

—কেন ? ভাত খাও না ? সে জন্যে পয়সা খরচ করতে হয় না ?

—ভাত খাই ঠাকুর, কিন্তু এক-একদিন খাইও না।

—কেন ?

—স্বামী হলো রুগী, একবছর হলো বিছানা নিয়েছে। বাড়িওয়ালা এখনও দয়া ক'রে ঘরে থাকতে দিচ্ছে। আর পাড়ার কেষ্টবাবু দয়া ক'রে বাড়ি থেকে ভাত পাঠিয়ে দেন বলেই···।

—তাহলে তো চলেই যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, বেঁচে আছি ঠিকই।

—তবে আর দুঃখ কিসের ?

কেঁদে ফেলে সত্যবাবুর বউ—কিন্তু আমার ছেলেটা কি বাঁচবে ঠাকুর ?

—কি হয়েছে ছেলের ?

—কে জানে কি হয়েছে ? গায়ে জ্বর, এই তিন মাসের মধ্যে ছেলে আমার একটা জিরজিরে কাঠি হয়ে গিয়েছে ঠাকুর। কি উপায় হবে ঠাকুর ?

—ভগবানকে বল।

—আপনিই তো ভগবান। তাই তো আপনাকে বলছি।

—কে বললে, আমি ভগবান ?

—কেউ বলেনি, আমার মন বলছে। আমি স্বপ্ন দেখেছি ঠাকুর।

হেসে ফেলেন সাধু রামানন্দ।

সত্যবাবুর বউ বলেন—ওরা কেউ আপনাকে চিনতে পারেনি ; মনে করেছে, আপনি একজন মস্ত সাধু। কিন্তু আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান। আমি বুঝেছি, আমি চিনেছি, আপনি আর আমাকে ছলনা করবেন না ঠাকুর।

সাধু রামনন্দের পায়ের কাছে চকচকে সিমেণ্টের মেজের উপর মাথা লুটিয়ে দিয়ে কাঁদতে থাকে সত্যবাবুর বউ।

সাধু রামানন্দ—কিন্তু তুমি কি চাও, সেটা তো বুঝতে পারছি না।

সত্যবাবুর বউ—আপনি একবার নিজে গিয়ে আমার ছেলের কপালে আপনার পা ঠেকিয়ে আসবেন। আমি স্বপ্ন দেখেছি ঠাকুর, তাহলেই আমার ছেলের রোগ সেরে যাবে।

—ছেলেকে নিয়ে এস তবে।

—নিয়ে আসা সম্ভব নয় ঠাকুর। ওকে একটু নাড়া দিলেই ওর প্রাণটা বের হয়ে যাবে বলে ভয় হয়। ছেলে আমার একমাস হলো একটু কাত হতেও পারে না, ঠাকুর।

সাধু রামানন্দের চোখ দুটো তীব্র হয়ে জ্বলতে থাকে।—আমি তোমার মর-মর ছেলের মাথায় পা ঠেকিয়ে দেবার পরেও যদি তোমার ছেলে ভাল না হয়, যদি তোমার ছেলে···।

—কি বলছেন ঠাকুর?

যেন হিংস্র হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সাধু রামানন্দ—যদি তোমার ছেলে মরে যায়? তবে?

—তবে জানবো, আপনার তাই ইচ্ছে।

—আমার ইচ্ছে?

—হ্যাঁ, ভগবান যা ইচ্ছে করবেন, তাই তো হবে। তাই তো মেনে নিতে হবে।

কী অদ্ভুত শান্ত নম্র আর অবিচল বিশ্বাসের এক নারী কথা বলছে।

সাধু রামানন্দ এই কবছরের সাধুত্বের জীবনে কত শত ভক্ত ও ভক্তার বিশ্বাসের কথা শুনেছেন। কিন্তু এমন বিশ্বাসের কথা শোনেন নি। ছেলে যদি মরে যায়, তবুও রামানন্দকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে ক'রে রাখবে, এ কী ভয়ানক বিশ্বাস।

সত্যিই যে ভগবান হতে ইচ্ছে করে। অন্তত একদিনের জন্য ভগবান হয়ে এই মহিলার মর-মর ছেলের মাথায় পা ঠেকিয়ে দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে। চেঁচিয়ে ওঠেন সাধু রামানন্দ—তুমি যাও।

—আমার কি উপায় হবে ঠাকুর?

—তুমি যাও। কোন কথা বলো না। তুমি আর এখানে এস না।

—ভগবান! সাধু রামানন্দের পায়ের কাছে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে যায় সত্যবাবুর বউ।

তিন

সন্ধ্যা হয়েছে সাধু রামানন্দের চোখে আজ ধ্যান নেই। ঘরের ভিতরে কোন ভক্তও নেই।

আজ সকাল থেকে একটিও ভক্তের আগমন হয়নি। কাল মাত্র তিনজন এসেছিল। সাধু রামানন্দের আত্মাও যেন সতর্ক হয়ে উঠেছে। লক্ষণ ভাল নয়।

শুধু কাল নয়, গত দশদিন ধরে ভক্তের আগমন ক্রমেই বিরল হয়ে এসেছে বুঝতে অসুবিধে নেই। ভক্তদের বিশ্বাসের জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে। শ্যামলাল সেই মামলাতে জয়ী হতে পারেনি। আশীর্বাদী ফুল নিয়ে গেল যারা, তাদের একজনেরও চাকরী হয়নি। মুন্সীবাবুর জামাই শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন, সাধু রামানন্দের আশীর্বাদী ফুলে কাজ হয়নি।

চাকর কৈলাসের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে সব খবর জানতে পেরেছেন সাধু রামানন্দ। কোন সন্দেহ নেই, এখানে আর পসার জমতে পারবে না! ঠিক সময়েই সরে যাওয়া নিয়ম। এইরকমই সময় বুঝে কানপুর থেকে সরে এখানে চলে এসেছিলেন সাধু রামানন্দ।

আজই, এই কিছুক্ষণ আগে ঝোলার ভিতর থেকে সব টাকা-পয়সা বের ক'রে আর গুণে নিয়ে, সেই সঞ্চয় একটা পুঁটলি ক'রে বেঁধে আবার ঝোলার ভেতরে রেখে দিয়েছেন সাধু রামানন্দ। কিন্তু আজই সরে পড়বার ইচ্ছে ছিল না।

কিন্তু না, আর দেরি করলে নিদারুণ ভুল করা হবে। ঐ যে, আজই বিকেলে এক ভদ্রলোক বাগানের ঐখানে দাঁড়িয়ে সাধু রামানন্দের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কে সেই ভদ্রলোক? তাকে যে পাঁচ বছর আগে কলকাতার লালবাজার থানার সেই ঘরে একদিন দেখেছিলেন সাধু রামানন্দ। কী আশ্চর্য সেই শিকারীর সন্ধান আজও ফুরোয়নি। আজও সেই হাতকড়ার প্রতিনিধি পৃথিবীর সব অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এক তহবিল-তছরুপ মামলার আসামীকে ধরবার জন্য ছুটোছুটি করছে। না, এক্ষুনি সরে পড়া চাই। কিন্তু···।

কোথায় যেন একটা বাধা। মনে হয়, ফটকের কাছে কলকাতার লাল-বাজারের সেই সাংঘাতিক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো, তাঁর জামার বুকপকেটে ফেরারী আসামীর ফটোটা আছে। সাধু রামানন্দকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে আর এই লম্বা চুলের ঝুঁটি কেটে দিলে যে চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে, সে চেহারার সঙ্গে ঐ ফটোর চেহারার যে কোন অমিল দেখতে পাওয়া যাবে না।

না, ফটক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া দারোয়ানও তো আশ্চর্য হয়ে বাধা দিতে পারে, এ কি; না বলে-কয়ে বাবুকে কিছুই না জানিয়ে, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনি ঝোলাঝুলি নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন সাধুজী?

কিন্তু ও বাধার জন্য চিন্তা কিসের? ফটক দিয়ে বের হয়ে যাবার

দরকার কি ? এই তো পাঁচিলের কাছে একটা পেয়ারা গাছ আছে। গাছের গা বেয়ে পাঁচিলের উপর চড়ে তার পরেই টুপ ক'রে একটি লাফ দিয়ে পিছনের গলিটাতে নেমে পড়তে পারা যায়। তারপর…তারপর আর কে আটকাবে সাধু রামানন্দকে ? ট্রেনে না উঠে, নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে আর সারা রাত হেঁটে অনেকদূরের এক গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে গিয়ে আস্তানা নিতে পারা যাবে।

ওটা বাধা নয়। তবে কিসের বাধা ?

কৈলাস চাকরটার কাছ থেকে একটা ঠিকানা না নিয়ে সরে পড়তে পারছেন না সাধু রামানন্দ। সেই মহিলা, সেই সত্যবাবুর বউ—কোথায় থাকে সে ? কতদূর ? রাস্তাটার নাম কি ?

কৈলাস এসেছে। কৈলাসের হাতে একটা বালতি। বোধহয় স্নানের জল তুলে দিয়ে যাবে কৈলাস।

সাধু রামানন্দ জিজ্ঞাসা করেন—ঐ যে আসতো এক মহিলা, সত্যবাবুর বউ, সে কোথায় থাকে বলতে পার ?

কৈলাশ—হ্যাঁ, কদমকুয়ার শিবমন্দিরের পাশে একটা গলিতে সত্যবাবুর বাড়ি।

জল তুলতে চলে যায় কৈলাস। আর, ছটফট করতে থাকেন সাধু রামানন্দ। যেন ভয়ংকর একটা শখের জ্বালা সাধু রামানন্দের বুকের ভিতরে ছটফট করছে। সত্যিই ভগবান হতে ইচ্ছে করছে।

ধরা তো পড়তেই হবে একদিন। তাছাড়া, না ধরা পড়লেই বা কি। চিরকাল এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে শুধু সাধু রামানন্দ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। ভগবান হবার সুখ কোনদিন কপালে জুটবে কি না সন্দেহ !

স্নানের জল দিয়ে চলে গেল কৈলাস। আর এক মুহূর্তও দেরি করেন না সাধু রামানন্দ। ঝোলাটা হাতে নিয়ে, পেয়ারা গাছে চড়ে আর পাঁচিল টপকে গলির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান।

চার

—ঠাকুর ! এসেছেন ঠাকুর ! ভগবান, তোমার এত দয়া। চেঁচিয়ে ওঠে সত্যবাবুর বউ।

—কোন চিন্তা করো না। আমি আছি। শান্ত কোমল সান্ত্বনার স্বরে কথা বলেন সাধু রামানন্দ।

বিছানার উপর শুয়ে আছে, ধুকধুক করছে একটা শিশুর এইটুকু একটা বুক। হাত-পা সত্যিই যে জিরজিরে চারটি কাঠি। শুধু মুখটা একটু জীবন্ত। আর মুখটাও যে বড় চমৎকার। শিশুটার মাথায় রেশমের

মত নরম ঝাঁকড়া চুল ফুরফুর করে উড়ছে, জানালা দিয়ে ফুরফুর করে বাতাস ঘরে ঢুকছে, তাই।

চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। সাধু রামানন্দ জিজ্ঞেস করেন—ঘুমিয়েছে বোধহয়।

—না ঠাকুর ; বেহুঁস হয়ে আছে।

—কোন ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে।

—আপনি ওর মাথায় একবার পা ঠেকিয়ে দিন ঠাকুর।

বিছানার কাছে এগিয়ে যান সাধু রামানন্দ। ছেলেটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

—দয়া করুন ঠাকুর। করুণ স্বরে মিনতি করে সত্যবাবুর বউ।

ছেলেটার ছোট্ট ছোট্ট পা দুটোকে আস্তে আস্তে হাতের উপর তুলে নিয়ে, তার পর সেই ছোট্ট পা দুটোর উপর ঝুঁটিওয়ালা মাথা ঘষে দিয়ে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ওঠেন সাধু রামানন্দ—হ্যাঁ, দয়া কর! দয়া কর ভগবান।

তারপরেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ান সাধু রামানন্দ। হেসে ফেলেন।—বাস, এবার আমি যাই।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান সাধু রামানন্দ। তারপরেই হাতের ঝোলাটাকে ঝুপ ক'রে মেজের উপর ফেলে দিয়ে সাধু রামানন্দ বলেন, এর মধ্যে অনেক টাকা আছে। আজ এখনই সব চেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে এনে ছেলেকে দেখাও। ভাল ক'রে ওষুধ খাওয়াও। ভাল ক'রে চিকিৎসা করাও।

আর কোন কথা না বলে দরজা দিয়ে এগিয়ে যান সাধু রামানন্দ।

পাশের ঘরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সত্যবাবুর বউ—ওগো, তুমিও একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ। ঠাকুর যে চলে যাচ্ছেন।

পাশের ঘরের অন্ধকারটা যেন ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে, দেখলাম! দেখলাম।

হেসে ওঠেন সাধু রামানন্দ—আমি চলি।

দরজার কাছে ঢিপ ক'রে মাথা ঠুকে কেঁদে ফেলে সত্যবাবুর বউ,—ভগবান। ভগবান।

—

সাদা ঘোড়া

রমেশচন্দ্র সেন

দাঙ্গার সময়ের একটি ঘটনা।

ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন রক্তস্নানের পর কলিকাতার অবস্থা একটু শান্ত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজ নিজ পল্লীতে কিছুটা নিঃসঙ্কোচে হাজির হয়। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব।

একদিন বৈকালে শূন্য ঠিকা গাড়ীর স্ট্যাণ্ডে সাদা রংয়ের একটি ঘোড়া দেখা গেল। ধবধবে সাদা, শরীরের কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত নাই। চামরের মতো তার সুন্দর ল্যাজের গোছার উপর রোদ ঝলমল করে। প্রাণীটি যেন পথভোলা এক পথিক। এ পাড়ায় আগে কেহই তাহাকে দেখে নাই। আশ্রয় হারাইয়া, আশ্রয়দাতাকে হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এ পাড়ায় আসিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় খালি রাস্তা শোঁকে। তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পথের ধুলা ওড়ে কিন্তু বেচারা কোথাও কিছু পায় না। শুধু আবর্জনার দুর্গন্ধময় স্তূপ শুঁকিয়া শুঁকিয়া মুখ ফিরাইয়া নেয়। জানালা দিয়া দেখিয়া, শীলার মা বলিলেন—বেচারী হয়তো কিছুই খেতে পায় না। সইস কোচোয়ান ফেলে পালিয়েছে। তাঁর নববিবাহিতা কন্যা শীলা কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, কেউ হয়তো তাদের মেরে ফেলেছে।

এ্যাঁ—শীলার মার মুখখানা একেবারে কালো হইয়া যায়। এই মহিলা কয়দিনে একটি মৃত্যুও দেখেন নাই। কিন্তু নিজের চোখে দু-একটা নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছেন। আর হত্যার কাহিনী শুনিয়াছেন অজস্র, হত্যা এবং হত্যার চেয়েও নির্মম। শুনিয়া শুনিয়া গা মিন মিন করে, অরুচি হয়। আসে অনিদ্রা। তবুও মানুষ যে এতো নৃশংস হইতে পারে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। বলেন সইস কোচোয়ান বেঁচে থাকতেও তো পারে।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত পল্লীতে সাদা এই জানোয়ারটা যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার করিল। তাহাকে লইয়া ছেলের দল মাতিয়া উঠিল। একেবারে ছোটরা দূর হইতে দেখিয়াই খুশি হয়। বড়রা তার গায়ে হাত বুলায়। ঘাড়ে হাত দিলে ঘোড়াটাও আনন্দে চিঁহি চিঁহি করে। তাকে লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলে নানারকম। প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করে, কোন রাজার কিংবা জমিদারের ঘোড়া হইবে। তারপরই ওঠে খাদ্যের কথা, বড়লোকের ঘোড়া

কী খায়, কতোটা পরিমাণ খায়। একজন বলে, জানিস ওরা মদ খায়, বিলিতি মদ! নন্তে মন্তব্য করে—মদ না খেলে এতো তেজী হয়? একটি ছেলের দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল। ঘোড়াটা সম্ভবতঃ ছেকরা গাড়ীর। সঙ্গে সঙ্গেই হাসির রোল ওঠে। নন্তে বলে, কতো ঘোড়াই না তুই দেখেছিস্। তোদের বিলেন দেশে জুড়ি চৌ ঘুড়ি চলে কিনা? এই আলোচনার মধ্যেই ঘোড়ার মুখে দড়ির লাগাম পরাইয়া যমুনা প্রসাদ তার পিঠে চাপিয়া বসিল, হাতে নিল একটা ছোট্ট ছড়ি। ছেলেটির বয়স বাইশ-তেইশ, রং কালো। ছিপছিপে গড়ন। গায়ে একটা গেঞ্জি। সে বায়োস্কোপের টিকিট কিনিয়া চড়া দামে বুকিং ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া সেই টিকিট বেচে। ফুটপাথের উপর জুয়া খেলিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে লাভের কড়ি উড়াইয়া দেয়। কিছু অবশিষ্ট থাকিলে খাঁটি খাইয়া চিল্লাচিল্লী করে।

কিন্তু দাঙ্গার এই কয়দিনে সে বেশ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যখনই পল্লীর বা নিকটের দেবমন্দির আক্রান্ত হয় তখনই সর্বাগ্রে শোনা যায় যমুনার কণ্ঠস্বর। সে সকলের আগে ছুটিয়া চলে। গোরা সৈন্যদের চা ও সিগারেট খাওয়াইয়া যমুনা তাদের সঙ্গেও বেশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেরা তাকে ডাকে মিলিটারী টি ক্যাপ্টেন। কিন্তু এই দুই দিন তাহার আর কিছু করার অবকাশ হয় নাই। প্রায় সব সময়ই ঘোড়ার উপর থাকে। বলে হাম সার্জন বনগিয়া। ছেলের দল তার পিছনে পিছনে ছোটে। দু-একবার কেহ হয়তো বলে, তুমি একবার নামনা যমুনা, আমরা একবার উঠে দেখি। যমুনা কোন জবাব দেয় না, ভ্রূক্ষেপ করে না, শুধু তালুতে জিভ ঠেকাইয়া শব্দ করে টক টক। হাবুল বলে—বাঃ, তুমি ঘোড়ায় চড়বে, আর আমরা বসে দেখবো—সে হবে না। যমুনা বলে, যা মোড়ের দোকানসে পান ঔর সিগারেট নে আয়, তারপর চড়বি। পয়সা? হামার নাম করবি—বলবি, যমুনা প্রসাদ মাংছে। মিনিট দুই-তিন পরে হাবুল আসিয়া বলিল—দিলে না, বললে, পৈসা লে আও। "শালা, ভেড়ীকা বাচ্চা। শালার দুকান বাঁচিয়ে ছিলাম। জুয়াসে ভি কতো পয়সা নাফা করল। আভি পানকো ওয়াস্তে দোগে পয়সা মাংছে" বলিয়া যমুনা পানের দোকানের দিকে ঘোড়াটা চালাইয়া দিল। হাবুলের আর ঘোড়ায় চড়া হইল না। অন্যবার এই সময় ছেলেরা সার্বজনীন পূজা-মণ্ডপে ভিড় করে। পটুয়া খড় দিয়া কাঠামো করে, মাটি ছানে, কাঠামোয় মাটি দেয়। ছেলের দল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। টুকিটাকি জিনিসপত্র আগাইয়া দিয়া পটুয়াকে সাহায্য করিয়া কতই না আনন্দ পায়। এবার এখনও মণ্ডপ ওঠে নাই। ছেলেরা সারাদিন ঘোড়াটাকে লইয়া ব্যস্ত। তারা তার নাম দিয়াছে চাঁদ, চাঁদের রংয়ের ঔজ্জ্বল্য ও কান্তি দিনের পর দিন ম্লান হয়। সে পা টানিয়া টানিয়া চলে। পিছনের বাঁ পায়ে ছোট্ট একটি দগদগে ঘা।

লীলার বাবা হৃষীকেশবাবু পাড়ার প্রবীণ লোক, ছেলেদের মুরব্বী স্থানীয়। তিনি হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ঘোড়াটাকে খেতে দিস তো রে ? হাবুল মন্তব্য করে—নন্তুদা বোধ হয় দেয়। নন্তেকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, আমি তো জানি না, যমুনা বলতে পারে। স্বামীর নিকট ব্যাপার শুনিয়া শীলার মা নন্তেকে দিয়া বাড়ীর নিচের দোকান হইতে কিছু ভুষি কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ঘোড়াটা অল্প একটু মুখে তুলিয়াই আর খাইল না। সন্তুর বন্ধু, খোকন বলিল—চাঁদের গলা আটকে গেছে, আয় জল নিয়ে আসি। দুইজনেই জল আনিল কিন্তু একজনের ভাঁড়ের মুখ ছোট হওয়ায় এবং অপরের মগের তলায় ছেঁদা থাকায় ঘোড়াটার আর জল খাওয়া হইল না। হাতের কাছে অন্য কোন পাত্র না পাইয়া বালক দুইটি পাশের চায়ের দোকান হইতে একখানা ভাঙ্গা ডিসে খানিকটা চা আনিয়া বলিল, আয় চাঁদু, খা। গোকুলের চা খুব ভালো, খেয়ে দেখ। কিন্তু গোকুলের চায়ের মাহাত্ম্য চাঁদকে মোটেই আকৃষ্ট করিল না। দু-একবার ডিস শুকিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া নিল।

ঘোড়াটা রোগা হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন জবু-থবু ভাব। ঘায়ের অবস্থাও আগের চেয়ে খারাপ। কিন্তু যমুনার চড়ার বিরাম নাই। হৃষীকেশ তাকে কহিলেন, ঘোড়াটাকে একটু রেহাই দিও যমুনা, নইলে যে মরে যাবে। যমুনা মদ খাইয়া বুঁদ হইয়াছিল। সে আধা-হিন্দী আধা বাংলায় যাহা বলিল তার সারাংশ এই, যেখানে হাজার হাজার মানুষ মরিল সেখানে একটা সামান্য জানোয়ারের জন্য আর দুঃখ করা কেন ?—বলিয়াই হাসিল, ছুরির শাণিত ফলার মতো তীক্ষ্ণ ক্রুর হাসি।

সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সাহায্যে হৃষীকেশ ঘোড়াটাকে সামনের ফাঁকা গ্যারেজে তুলিয়া দিলেন, সঙ্গে দিলেন এক বালতি জল ও কিছু বিচালি। সবেমাত্র তাহারা বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় চলমান লরি হইতে শান্তিরক্ষীর দল ফুকরাইয়া গেল, ভিতরে যাও, ভিতরে যাও। পরদিন সকালে দেখা যায়, গ্যারেজে তালা লাগানো, দরজার পাশেই হৃষীকেশের বালতি, অদূরে ঘোড়াটা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া। চোখে একটুও দীপ্তি নাই। লেজ নাড়াইয়া মাছি তাড়াইবার শক্তিও নাই, মনে হয় এখনই পড়িয়া যাইবে। সন্তু তাড়াতাড়ি চারটি ছোলা আনিয়া দিল। চাঁদ তাহা মুখে তুলিল না। নন্তে বলিল, দেখিতো সন্তু, আমার হাতে খায় কিনা। অনেক ঘোড়াকে আমি খাইয়েছি। জানিস আমাদের ঘোড়ার গাড়ী ছিল। কিন্তু এই প্রাণীটি তার এই আত্মবিশ্বাসেও আঘাত করিল। নন্তে বলিল, রোগটার সিরিয়সিটি দেখছি খুবই। শীলার মা দুঃখ করিতে লাগিলেন, আহা বেচারীর দেখছি দাঁড়াবার খ্যামতা নাই। কিন্তু একবার শুইলে আর উঠবে না। শীলা জিজ্ঞাসা করে, ঘোড়া নাকি দাঁড়িয়ে ঘুমোয় ?

হৃষীকেশ বলিলেন, কে বললে, আটদিন বাদে ওরাও একবার গড়িয়ে নেয়।

বেলা দশটা। কড়া রোদ যেন গায়ে চাবুক মারে। চাঁদ ছটফট করে, ছেলেরা তাকে ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া টেবুদের গাড়ী-বারান্দার তলায় লইয়া যায়। শান্ত তাদের আশ্বাস দেয়, সাদা জানোয়ার জলের রোদ সহ্য হয় না। ওতে ভয়ের কিছুই নেই। এমন সময় বড় রাস্তার মোড়ে বেঁটে-খাটো একটি মানুষের আবির্ভাব হয়। এদিক-ওদিক চাহিয়া লোকটি গলিতে ঢোকে। এক গাল পাকা গোঁফ-দাড়ি, খালি গা, পরণে ময়লা লুঙি, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগ। মগটা রোদে চকচক করিতেছিল। এমনিতেই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তার উপর এই সময় এই পাড়ায় তাহাকে দেখিয়াই সকলেই মুখ চাওয়া-চাউয়ি করিতে লাগিলেন। হৃষীকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, এখন ও এ পাড়ায় এল কেন? কিন্তু লোকটির কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কি যেন খোঁজে, দীর্ঘ পথের দুই ধারে বারবার চোখ বুলাইয়া নেয়।

প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, একটু পরে সাদা ঘোড়াটাকে দেখিয়া তার চোখ যেন জ্বলিয়া ওঠে। দ্রুতপদে কাছে গিয়া তার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ তাদের দেশী ভাষায় বলে, আঃ সোরাবে তোর এমন দশা হয়েছে!

পরিচিত এই স্পর্শে প্রাণীটি চঞ্চল হইয়া ওঠে। সেও চোখ তুলিয়া চায়। মানুষের চাহনির মতন অর্থপূর্ণ সেই দৃষ্টি অনেক কিছুই প্রকাশ করে। ভাষায় হয়তো ততটা বলিতে পারে না। বুদো ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করে এর নাম বুঝি সোয়াব? আমরা ডাকি চাঁদ। বৃদ্ধ সহিস কহিল ওত একই হ্যায়। শান্ত জিজ্ঞাসা করিল ঘোড়াটা তোমার? না বাবু ভাড়া-গাড়ীর ঘোড়া। আমি সহিস-কোচোয়ন দুইই। শান্ত বলিল, তার মানেই তোমার ঘোড়া। ঠিক হ্যায় বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসে। তারপর কল হইতে মগটায় জল ভরিয়া আনিয়া ঘোড়ার মুখের কাছে ধরে। জলটুকু নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলে ছেলের দল চীৎকার করিয়া ওঠে "জয়হিন্দ"! সইস লুঙ্গির ভিতরে গোঁজা একটি ঠোঙ্গায় ছোলা আনিয়া ছিল। সেই ছোলা সে ঘোড়াটাকে হাতে করিয়া খাওয়াইল। ছোলা ফুরাইয়া গেলে, ছেলেদের বলিল, ওর চারটো চানা মিলে না বাবু? "জরুর" বলিয়া শান্ত ছুটিল। সঙ্গে ছুটিল হাবুল ও গয়ার দল। এক সঙ্গে ছোলা আসিল চার ঠোঙ্গা। জানোয়ারটা আর একটু চাঙ্গা হইলে বৃদ্ধ বলিল, বেমার হলে সুরাব আমার হাতে ছাড়া খায় না।

তার মনে পড়িল অনেক কথা। ঘোড়াটাকে কত টাকায় কেনা হইয়াছিল। তার বয়স তখন কত, কয়টা দাঁত উঠিয়াছিল—এই সব। সোরাবের চলন দেখিয়া লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করিত, বাজি জিতিবার এই

ঘোড়াটাকে সে ঠিকা গাড়ীতে জুড়িয়াছে কেন? নিজের কপালে হাত ছোঁয়াইয়া সে কহিত, নসীব। মানুষের মতো জানোয়ারেরও নসীব আছে কিনা? একটু পরে সে হৃষীকেশকে প্রশ্ন করিল, কবে সব ঠাণ্ডা হোবে বড়বাবু। দিন ঠিকা গাড়ী চালু হবে। রাস্তামে ডর ঔর কুছ থাকবে না। লোকটি আগের মতনই শান্তিপূর্ণ দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল। হৃষীকেশ তার প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

হঠাৎ যেন দানবের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অদূরে চৌরাস্তার মোড়ে সে আড়মোরা ভাঙে। ঝঞ্ঝার বেগে খবর ছুটিয়া আসে লালপট্টিতে গোলাগুলি সুরু হইয়াছে। খালের মধ্যে নদীর বেনো জলের মতন বহু লোক রাস্তার জনস্রোতের একটা অংশ হু হু করিয়া এই রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িল। আরম্ভ হয় ছুটাছুটি, কলরব, মার মার শব্দ। বুড়া সহিস এক-একবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকায়। সোরাবের চোখেও ফুটিয়া ওঠে অপরূপ করুণ দৃষ্টি, হয়তো সে তার পালকের বিপদ বুঝিতে পারে। নন্তে সহিসকে বলে, কিছু ভয় নেই তোমার। কিন্তু অপরিচিত শত শত হিংস্র চোখের সামনে সহিস কেমন যেন ভরসাও পায় না। কয়েকটা লোক আগাইয়া আসে। যমুনা, নন্তে, হাবুল প্রভৃতি তরুণের দল বৃদ্ধের চারধারে কর্ডন করিয়া দাঁড়ায়। হৃষীকেশ আক্রমণকারীদের শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। বলেন, এ একটা নিরীহ লোক, ওকে মারবেন না। জনতার মধ্য থেকে প্রতিবাদ আসে। মানুষ নেই, ও জানোয়ার আছে, এর মধ্যে মেটিয়াবুরুজ ভুলে গেলেন সবাই। টুথ ফর এ টুথ। হৃষীকেশ বলিলেন, কতো জায়গায় ওরা আমাদের বাঁচিয়েছে জানেন? আমরাও ঢের বাঁচিয়েছি। ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দিন। বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। তর্ক করা শুধু নিরর্থকই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তাই যমুনা ও নন্তে বলে, চুপ করুন কাকাবাবু, বলিয়া দুজনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। যমুনা বলে, আও মারনেওয়ালা কৌন হ্যায়, আও। একটি ছোকরা চেঁচাইয়া ওঠে; আমাদের সাদা ঘোড়ার সহিসকে, আমাদের চাঁদের সহিসকে কেউ মারতে পারবে না। জনতা একটুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর আবার কলরব শুরু হয়। ছেলেদের গায়ে ঢিল পড়ে। এই সময় মোড়ের চারতলার বাড়ীর ছাদে একজন চীৎকার করিয়া বলে, মিলিটারি, আরম্ভ হয় দৌড়-প্রতিযোগিতা। আশে-পাশের গলি খুঁজি, খোলা দরজায়, যে যেখানে সম্ভব ঢুকিয়া পড়ে। বৃদ্ধ সহিসকে পাঁজাকোলা করিয়া যমুনাপ্রসাদ হৃষীকেশবাবুর বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া যায়। গুম্ গুড়ুম্ গুম্। গাড়ী হইতে নামিয়া সৈন্যরা রাজপথে টহল দেয়। তাদের জুতার শব্দ ভিন্ন সারাটা পল্লীতে আর কোনও শব্দ নাই, সে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, দরজা জানালা বন্ধ। জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়াও কেহ কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে ভরসা পায় না। সবারই মুখে অজানা উদ্বেগের ছাপ।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। প্রথমে বাহির হয় নন্তে ও যমুনাপ্রসাদ, পিছনে বৃদ্ধ সহিস দরজা খুলিতেই তাদের চোখে পড়ে রৌদ্রদগ্ধ রাজপথের রিক্ত রূপ, যেন মহাশ্মশান। বাঁদিকে মুখ ফিরাইয়াই তিনজনে শিহরিয়া ওঠে। একী! ঘোড়াটা পথে পড়িয়া আছে। কালো পিচের মধ্যে তার সাদা রং আরও খুলিয়াছে। দেহ পথের উপর মাথাটা ফুটপাথে। ডান কানের পাশে গোল একটা ক্ষত চিহ্ন। বৃদ্ধ সহিস ডাকিল, সোরাব সোরাব। সোরাব কোন উত্তর করিল না। বৃদ্ধের ডাকে সোরাবের সাড়া না দেওয়া এই প্রথম।

সোরাব তখন আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। হীরক স্বচ্ছ আকাশের মতই নির্মল দৃষ্টি। সে চাহনিতে কোনও বেদনা নাই, গ্লানি নাই হৃষীকেশও পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঘোড়াটার চোখের দিকে চাহিয়া তিনি একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অনাচার

আশাপূর্ণা দেবী

সুভাষ-কাকীমার নামে একেবারে ছিছিকার পড়ে গেল। মেয়েমানুষ যে এতো বড়ো কঠিন প্রাণ হ'তে পারে এ যেন ধারণার অতীত।

মেয়েমানুষ কেন, কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? যে কঠোর কাজ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব, তেমন কাজ যদি কোনো মেয়েমানুষে অম্লানবদনে করতে পারে, তা'হলে তাকে লোকে কি না বলবে!

কতোটুকুই বা বলতে পারবে?

আমার নিজের কাকীমা আর মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন, বোধ হয় মনের ওপর এতোবড়ো একটা ধাক্কার ধাক্কা সামলাতে।

সুভাষ-কাকীমারা আমাদের জ্ঞাতি নয়, কাজেই অশৌচের বালাই নেই। তা'ছাড়া—মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে সধবা মানুষের নাকি তক্ষুনি স্নান করতে নেই, তাই মা কাকীমা কাপড় ছেড়ে বসেছেন। পিসিমা একেবারে ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে ফিরলেন।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিজে থানের আঁচলটা নিঙড়ে নিঙড়ে সেই নিঙড়ানো জলটুকু দিয়ে পা ধুয়ে দালানে উঠে পিসিমা চাঁচাছোলা মাজাঘসা গলায়

বলে উঠলেন—যাক, এতোদিনে গিরীনখুড়োর হাড় ক'খানা জুড়োলো। আহা, আজন্ম দুঃখী। রোগে-শোকে জরজর দেহখানা টিঁকে ছিল শুধু পরমায়ু ফুরোয়নি বলেই। নইলে মরেই তো ছিলেন।

আলনা থেকে শুকনো মটকার থানখানা পেড়ে নিয়ে প'রে মার কাছাকাছি বসে পড়ে থানের আঁচলখানা দিয়েই ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন পিসিমা।

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন—'মানুষজন্ম' হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনো শুনি নি ঠাকুরঝি!

—তুমি তো সেদিনের মেয়ে বৌ, তুমি শোনো নি—সে কিছু মস্ত কথা নয়। জগতের কেউ কখনো শুনেছে?

কাকীমা বললেন—আমি শুধু ভাবছি—পারলো কি করে? প্রাণ ছিঁড়ে পড়লো না! একদিন নয়, আধ দিন নয়, ছ'সাত মাস। এই দুরন্ত সংবাদ চেপে রেখে স্থির থাকা, উঃ ভাবাই যায় না!

—পাষাণে তৈরী বুক!—বললেন মা!

পিসিমা বললেন—ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে। সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিল, তখন মনে হতো বুঝি এমন ভালবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর—ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেল কেন, তাই বা কে বলবে? আমার মনে নিচ্ছে—বৌয়ের ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছলো।

জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। মানুষকে ধিক্কার দেবার যতো রকম ভাষা আছে, সব এঁরা একে একে ব্যবহার করবেন। শেষ পর্যন্ত সংসারের কাজের তাড়ায় যদি ওঠেন।

চুপচাপ খানিক শুয়ে অবেলায়—অন্যমনা-ভাবে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ রবিবার। রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু কিছুতেই যেন ইচ্ছে হলো না। সারাদিন সুভাষ-কাকীমা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে শুনতেই বোধ করি এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন, সামান্য একটু আলোচনার বস্তু পেলে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। সে জায়গায় এতো বড় একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! এরপর—সুভাষ-কাকীমাকে কোন্ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হতে হবে কে জানে!

আচ্ছা, সুভাষ-কাকীমা কি কোনো গর্হিত অপরাধ করেছেন? না কি কুলধর্ম নষ্ট করেছেন? না সামাজিক কোনো অনাচার করেছেন? কি যে করেছেন, সে কথা বলা বড়ো শক্ত। যা করেছেন, সে কাজ বোধহয় কেউ কখনো করেনি, তাই সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখনো হয়নি।

ফিরতি পথে দেখি দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনকতক মিলে ওই আলোচনাই চালাচ্ছে। রোয়াকের সিঁড়িতে তিন-চারটে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিবু-নিবু অবস্থায় কমিয়ে বসানো আছে। অন্ধকারে ঠিক চেনা কাউকেই যাচ্ছে না।

শুক্লপক্ষে কেরোসিন খরচের দরকার বড়ো হয় না, রাতবিরেতে পথ হাঁটতে একটা লাঠি ঠকঠকই যথেষ্ট। কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজ গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, আজ সন্ধ্যার পর থেকে পথে বেরোতে হাতে একটু আগুনের ছোঁয়া থাকা ভালো।

গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে মাণিক জ্বলে। আমাকে দেখেই দীনেশ রায় হাঁক দিলেন—কে যাচ্ছে ওখানে ? মনোতোষ না কি ?

বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

দীনেশ রায় বললেন—আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোও নি কেন বাবাজী ?

বললাম—বিকেলে বেরিয়েছি।

—আচ্ছা বোসো একটু। এই সুরেনদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন, এক সঙ্গে যেও, আলো ধরে দাঁড়িয়ে দেবেন অখন।

—দরকার হবে না !—বলে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে ?

দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমার দরকার নেই, আমার দরকার আছে। আমি তোমায় একা আঁধারে ছেড়ে দিতে পারি না। এসো এসো।···তারপর আজ আর ফিরবে না বুঝি ?

—আজ্ঞে না। কাল যাবো।

—কাল ছুটি আছে না কি ?

—নাঃ, ছুটি কিসের ?

—তবে ?

জানি উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। এই এঁদের বিশেষত্ব।

বললাম—এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগলো না।

দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন—হুঁঃ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে ? দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছো একেবারে, কি বলো ? সুভাষের স্ত্রীর কীর্তিকলাপ শুনলে তো ?

—শুনলাম।

—বলি তোমরা তো কলকাতায় থাকো হে, অনেক রকম কেতা দেখা অভ্যেস ; এমন কেতা দেখেছো সেখানে ?

বিনীতভাবে বললাম—আজ্ঞে না।

সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন—সাফাই শুনলে তো ? বলে কিনা বুড়োমানুষটার মনে দাগা লাগবে বলে—তাই ! শ্বশুরের জন্যে

প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছিলেন। ছেলে ভোলানো আর বলে কাকে !···বলি—তুই পারলি কি করে তাই বল ?

—অসৎ মেয়েদের রীতির কথা ছেড়ে দাও স্বরেনদা, তারা কি পারে আর না পারে !···খবরটা বুড়োর কানে উঠলেই তো—মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত।

মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম।

বললাম—আচ্ছা কাকা, আমি চলি।

—আঁধারেই চললে ?

—হ্যাঁ।—নেমে পড়লাম।

দীনেশ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—বলি পৈতে গাছটা গলায় আছো তো হে ? না কি কলকেতার ফ্যাসানে ধোবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছো ? গাছতলা দিয়ে যাওয়া—মানো না তো কিছু ! মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না, ঘুরে বেড়ায় বুঝলে ?

গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে আবার বাড়ির বিপরীত দিকে ঘুরলাম।

মৃত আত্মা জায়গা ছেড়ে না নড়ে যদি তিনদিন ধরে সেইখানেই ঘুরে মরে, তাহলে গিরীনঠাকুর্দার আত্মাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোথাও ঘুরছে। এ সব ঘটনা টের পাচ্ছে, এ সব আলোচনা শুনতে পাচ্ছে।

কি হচ্ছে সে আত্মা ? সন্তুষ্ট ? না কি এইসব গ্রাম্য বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে চাইছে ? কে জানে কি।

স্বভাষ-কাকীমার প্রতি খুব বেশী স্নেহভাব তো কখনো দেখি নি তাঁর। তা'ছাড়া—স্বভাষ কাকা "সিনেমা সিনেমা" হুজুগ করে বম্বে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তো যতো দূর নয় ততো দূর খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন, পুত্র-বধূর ওপরও কম খাপ্পা হননি। অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।

ছ'টি সন্তানের মধ্যে স্বভাষ তাঁর শেষ অবশিষ্ট সন্তান। সেই ছেলেও যদি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়, তার স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে না ধরে রাখবার, তাহলে কি করে তিনি সেই অক্ষমতাকে মার্জনা করতে পারেন ? কি করে প্রসন্ন থাকতে পারেন বৌয়ের ওপর ?

বৃদ্ধ শ্বশুর আর তরুণী পুত্রবধূ—এই সংসার। শ্বশুর যদি রাগ করে সাবু বার্লি সমেত ভারি কাঁসার বাটিটা বে-আন্দাজী ছুঁড়ে মেরে বৌয়ের কপাল ফাটান, তাহলেও কেউ ধরবার নেই।

প্রথম প্রথম নাকি খুব চিঠির ঘটা ছিলো স্বভাষ কাকার, টাকাও পাঠিয়েছিলেন ক'বার, কিন্তু মাস ছয়-সাত আর কোনো খবর নেই।

না টাকা, না চিঠি। সংসারে দারিদ্র্যের চরম। পাড়ার গিন্নীদের দিয়ে নিজের যা একটু সোনাদানা ছিল, সবই বিক্রি করিয়েছিলেন স্বভাষ-খুড়িমা।

বম্বে গিয়ে স্বভাষ কাকা যে, কোনো কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন, সে বিষয়ে আর কারুর মতদ্বৈধ ছিল না।

ওদের যে কি করে চলে, সেকথা গ্রামের কেউ কোনোদিন ভেবে দেখেনি, কিন্তু ওদের নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না।

একটা অসহায় মেয়েমানুষ যে নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বামী অনাসক্ত হয়ে গেছে বুঝেও ভেঙে পড়বে না, সব সময় হেসে কথা কইবে লোকের সঙ্গে, এটা সত্যিই বড়ো দৃষ্টিকটু। কিন্তু সে তো তবু সহ্যের সীমানায় ছিল। আর আজ যা জানা গেল। এ যে সহ্যের অতীত।

আজ যা জানা গেল—সেটা হচ্ছে এই—গিরীনঠাকুর্দার মৃতদেহ যখন পড়ে, আর বাড়ি লোকে লোকারণ্য, তখন সুভাষ-কাকীমা পাড়ার সমস্ত মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সামনে একখানা খামের চিঠি ফেলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই নিন, এ চিঠি পড়ুন। পড়ে আমার কি কর্তব্য আদেশ দিন। যদি কোনো প্রায়শ্চিত্তের দরকার থাকে, তার ব্যবস্থাও দেবেন।

একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

প্রবীণেরা সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন এই ভেবে যে গিরীনঠাকুর্দার হয়তো লুকানো টাকাকড়ি কিছু ছিল, সেই সংক্রান্ত কোনো লেখাপড়া।

চিঠিটাই হাঁ হাঁ করে কুড়িয়ে নিয়েছে লোকে, বাক্যার্থের দিকে কান দেয় নি।

মুখছেঁড়া খাম, পুরনো চিঠি, বার করতেই যতগুলো সম্ভব মাথা তার ওপরে ঝুঁকে পড়লো। কিন্তু এ কী? এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা?

প্রবীণদের মুখভঙ্গী দেখে, যারা চিঠি পড়েনি তারা উদগ্রীব হয়ে তাকালো—ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা কি?

সতীশ কুণ্ডু একটু ক্ষোভ এবং ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে, চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন—সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, বলে ফেলাই ভালো। সুভাষ বাবাজী আজ সাত মাস হলো গত হয়েছেন। বম্বে থেকে তাঁর এক বন্ধু যথা সময়েই জানিয়েছিলেন, তবে বৌমা এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

ঘরের মধ্যে কি বাজ পড়লো!

মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার সংবাদ এমন কিছু নতুন নয়। সময়ে অসময়ে অবস্থা বিবেচনা করে লোকে এমন করে থাকে কখনো কখনো। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন করবে স্ত্রী? উদ্দেশ্যটা কি?

ভিড়ের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠলো!

প্রবীণারা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, আর সুভাষ-কাকীমা ভাবলেশশূন্য মুখে শ্বশুরের অসুখের সময়ে ব্যবহৃত ঔষুধের শিশি, কাঁচের গেলাস, পিকদানি, কাঁথাকানি, জামা কাপড় ইত্যাদি একত্রে জড় করতে লাগলেন। অতঃপর কে একজন মহিলা বললেন—হ্যাঁ সতীশ, বৌমার করণীয় কাজ তাহলে কি হবে?

সতীশ কুণ্ডু বললেন—আপনারাই বলুন। আমার এই ষাট বছর বয়সে এমন ঘটনা তো দেখিনি সত্যদি, অজান্তে হয়—সে আলাদা। বলে অজান্তে সাপের বিষে দোষ লাগে না।

সত্যদি বললেন—ছাইপাঁশ শাখা সিঁদুরের ব্যবস্থা নয় আমি করে দিলাম, কিন্তু একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো? জেনে শুনে এমন অনাচার!···হ্যাঁ গা বৌমা, এ চিঠি চেপে রাখবার বুদ্ধি তোমায় কে দিলে বাছা?

সুভাষ-কাকীমা মুখ তুলে, কে জানে হয়তো বা একটু হেসেই বললেন—বুদ্ধি আর কে দেবে পিসিমা? বোধহয় আমার দুর্মতিই দিয়েছে।

—যাই হোক, বলি এর একটা মানে তো আছে? যদি উড়ো চিঠি বলে অবিশ্বাস এসে থাকে, পাড়ার পাঁচটা বিচক্ষণ লোককে দেখাতে হয় তো?

—অবিশ্বাস তো করিনি পিসিমা।

—তা' হলে?

সুভাষ-কাকীমা এইবার হাতের কাজ থামালেন, স্থির ভাবে বললেন—ভেবেছিলাম বাবা বুড়োমানুষ, জীবনভোর অনেক শোকতাপ তো পেয়েছেন, মরণকালে না হয় আর নাই পেলেন।

—এইটাই কি আর একটা সহজ মানুষের মতন কাজ হলো বাছা?—সত্যপিসি বললেন—যে যার কর্মফল নিয়ে এসেছে, ভোগ না করে উপায় কি? এই যে তুমি ছ'মাস ধরে জেনে শুনে তার ভিটেয় বসে বিধবা হয়ে সধবার আচরণ করলে, তাতেই কি তার ভালো করলে? এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না?···যাক, এখন ভট্‌চাজকে ডাকো, কি বলে সে দেখি। নারায়ণ নারায়ণ!

ভট্‌চাজও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে এলেন। শুনে এসেছেন তো সব।

তিনি বিধান দিলেন, যেহেতু গিরীনঠাকুর্দা শ্বশুর, সেই হেতু তাঁর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূর বৈধব্যসাজ গ্রহণ দৃষ্টিকটু। অতএব মৃতদেহ বার করার আগেই সুভাষ-কাকীমার 'শেষকৃত্য' করে দেওয়া হোক।

সুভাষ-কাকীমা বললেন—আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা? না, আমি একা গেলে চলবে?

সত্যপিসি গম্ভীর বদনে বললেন—তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি, তবে আমার তো একটা কর্তব্য আছে? সেই আঠারো বছর বয়েস থেকে এই কাজে চুল পাকালাম।···নাও চলো।···থাক্ থাক্, গামছা কাপড় কিছু নেবার দরকার নেই।···নাও দীনেশ, তোমরা ততোক্ষণ ইদিক্‌কের গোছগাছ করো।

এতো বড়ো একটা কাণ্ডে সুভাষ-কাকীমা তাঁকে কাঁদবার কোনো সুযোগই দিলেন না দেখে বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসী!

এ সব হলো সকালের কথা। রবিবার বলেই আমি ছিলাম।

এখন বাড়ির বিপরীত মুখে চলতে চলতে—কোনো আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে কে জানে—গেলাম গিরীনঠাকুরদারই বাড়িতে। রাত হয়ে গেছে, সে কথা আগে খেয়াল হয়নি, খেয়াল হলো সুভাষ-কাকীমার দরজায় এসে।

ইতস্তত করে চলেই আসছিলাম, হঠাৎ দেখলাম পঞ্চা কলুর ছোট মেয়েটা বেরিয়ে এসে বললো—দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে? কাকীমা শুধালো কিছু দরকার আছে?

বললাম—না, এমনি দেখতে এসেছিলাম। তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেলো। বললে—"বুড়ো তো ম'লো, বামুনদিদি একা থাকবে? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে!"

—পাড়ার আর কেউ নেই?

—না তো!

কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকীমা বেরিয়ে এলেন। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সাজসজ্জার পরিবর্তন বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না তাই রক্ষে।

সুভাষ-কাকীমা আমার চাইতে বয়সে বড়ো নয়, নিজের কাকীও নয়, তাই প্রণাম কখনো করিনি, অতএব "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম!

বললেন—মনোতোষ না? এমন সময় এদিকে?

— ভাবলাম আপনার একটা খবর—

—এসেছো তো ভালই হয়েছে ভাই—বলেই থামলেন, সামান্য একটু হেসে বললেন—'ভাই' বলেই বলছি কিছু মনে কোরো না, 'বাবা বাছা' করে বলতে পারি না। বলছি—গ্রামে আর কাউকে বলতে পারিনি, তোমায় বলছি—তোমার কাকার তো পারলৌকিক কাজের কিছুই হয়নি, এতোদিন পরে কিছু হয় কিনা, কিংবা কি হয়, তোমাদের কলকাতার কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করতে পারো?

বললাম—আচ্ছা!

—আর শোনো, ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরেই বললাম—কেন? আপনার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের?

—মস্ত একটা পাপ তো করলাম এতোদিন ধরে? বিধবা হয়ে জেনে শুনে সে খবর চেপে রেখে সধবার আচরণ করা! হিন্দুধর্ম কি এতোটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?

আমি গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলাম—'পাপ' বলে নিজে স্বীকার করেন আপনি?

—করেছি বৈকি ভাই, হাজার হোক হিন্দুরই মেয়ে তো ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের লোভটাও মস্ত হয়ে উঠেছিল। ভাবলাম বুড়ো মানুষকে এই শেষ জীবনে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিই কেন ? ওঁকে পুত্র-শোকের হাত থেকে রক্ষা করতে তো আমিই পারি ? দেখি না ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে। তাই রাবণ রাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম।

রাগ করে বললাম—তা' যথাসময়ে তো আবার নিজে হাতেই বার করে দিয়েছেন। এতোদিনের যন্ত্রণার কথা থাক, আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি ?

সুভাষ-কাকীমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—কি জানি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে একটা কিছু শাস্তিই হোক ! খুব কঠিন শাস্তি ! এতোদিন ধরে হেসে গল্প করে সহজ হয়ে বেড়ানোর জন্যে ভয়ঙ্কর কোনো শাস্তি !···অজান্তে সাপের বিষ খেলে দোষ হয় না জানি, কিন্তু জেনে বুঝে সে বিষ হজম করলে ? তার জন্যে শক্ত বিধান শাস্ত্রে নেই ?

উত্তর যোগাচ্ছিল না। হঠাৎ বারো বছরের 'নন্দী' চৈতন্য করিয়ে দিলো—দাদাবাবু এবার ঘরে যাও। গাঁ ঘরের নোক তো ভালো নয়। কোথায় আনাচকানাচ দে' দেখবে আর কুচ্ছো রটাবে। 'আত' হয়েছে তো !

কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি !

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও এক কথায় উল্টো মুখ ধরতে পারাও শক্ত। তাই বললাম—একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করবো কাকীমা, গিরীনঠাকুর্দা আপনার সঙ্গে যা ব্যবহার করতেন, সে তো কারুর অবিদিত নেই ? অথচ তার জন্যে—

—এটা কি একটা কথা হলো মনোতোষ—কাকীমা হেসে ফেললেন—উনি রাগের মাথায় যখন তখন আমার মাথা লক্ষ্য করে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন বলে আমি জেনে বুঝে ওঁর মাথায় লাঠি বসানোর ভারটা নেবো ?

—কিন্তু লোকে কি এর মর্ম বুঝলো ?

—লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয় ভাই !

—আচ্ছা আর একটি শেষ কথা—কিছুতেই এ সন্দেহকে দূর করতে পারছি না। ভাবছি কি করে পারলেন ?

সুভাষ-কাকীমা এবারেও একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না মনোতোষ—কি করে পারলাম ?

দেবতার জন্ম

শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে বেরুতে প্রায়ই হোঁচট খাই। প্রথম পদক্ষেপেই পাথরটা তার অস্তিত্বের কথা প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কদিন ধরেই ভাবছি কি করা যায়।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার আমার তেমন কোনো তাড়া ছিল না, অন্ততঃ ঐরূপ তীরবেগে অকস্মাৎ ধাবিত হব এমন অভিপ্রায় ছিল না আদৌ, কিন্তু পাথরটার সংঘর্ষ আমার গতিবেগকে সহসা এত দ্রুত করে দিল যে, অন্যদিক থেকে মোটর আসছে দেখেও আত্মসম্বরণ করতে অক্ষম হলুম, কি ভাগ্যি, ড্রাইভারটা ছিলো হুঁশিয়ার—তাই রক্ষে।

সেদিন থেকেই ভাবছি কি করা যায়। আমার জীবনপথের মাঝখানে সামান্য একটুকরো পাথর যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেবে কোনো দিন এরূপ কল্পনা করিনি। তাছাড়া, ক্রমশই এটা জীবন-মরণের সমস্যা হয়ে উঠছে, কেননা ধাবমান মোটর চিরদিনই কিছু আমার পদস্খলনকে মার্জনার চোখে দেখবে এমন আশা আমি করতে পারি না।

তাই ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক, হয় ও থাকুক নয় আমি। ও থাকলে আমি বেশিদিন থাকব কিনা সন্দেহ হল। তাই যখন আমার থাকাটাই, অন্তত আমার দিক থেকে বেশি বাঞ্ছনীয়, তখন একদা প্রাতঃকালে একটা কোদাল যোগাড় করে লেগে পড়তে হোলো।

একটা বড় গোছের নুড়ি, ওর সামান্য অংশই রাস্তার উপর মাথা তুলেছিল। বহু পরিশ্রমের পর যখন ওটাকে সমূলে উৎখাত করতে পেরেছি, তখন মাথার ঘাম মুছে দেখি আমার চারিদিকে রীতিমত জনতা। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ এঁদেরই নীরব ও সরব সহানুভূতি আমার উদ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করছিল।

তাঁদের সকলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— আপনারা কেউ চান এই পাথরটা ?

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কারু উৎসুক্য আছে কি নেই বোঝা গেল না। তাই আবার ঘোষণা করতে হোলো—যদি দরকার থাকে নিতে পারেন। অনায়াসেই নিতে পারেন। আমার শ্রম তাহলে সার্থক জ্ঞান করব এবং আমি খুশি হব।

জনতার এক তরফ থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—এটা খুঁড়ছিলেন কেন? কোনো স্বপ্ন টপ্ন পেয়েছেন নাকি?

আমি লোকটার দিকে একটু তাকালাম, তারপর ঘাড় নেড়ে বললাম—না, যা ভাবছেন তা নয়।

পাথরটাকে রাস্তার এক নিরাপদ কোণে স্থাপিত করা গেল। কিন্তু আমার কথায় যেন ওর প্রত্যয় হোলো না, কয়েকবার আপনমনে মাথা নেড়ে সে আবার প্রশ্ন করলে—সত্যি বলছেন পাননি? কোনো প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ?

—কিচ্ছু না।

লোকটার কৌতূহলকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে ওপরে এসে মাকে বললাম দু' কাপ চা তৈরী করতে। আমার জন্যই দু' কাপ। পাথরটার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কাতর হয়ে পড়েছিলাম—প্রায় প্রস্তরীভূত হয়ে গেছলাম, বলতে কি!

এরপর প্রায়ই বাড়ি থকে বেরুতে এবং বেড়িয়ে ফিরতে নুড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; অনেক সময় হয় না, যখন অন্যমনস্ক থাকি। এখন ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করতে পেরেছি, কেননা আমাকে অপদস্থ করার ক্ষমতা ওর আর নেই। সে-দৈবশক্তি ওর লোপ পেয়েছে।

আমাদের মধ্যে একরকম হৃদ্যতা জন্মেছে এখন বলা যেতে পারে। এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন দেখলাম নুড়িটার কান্তি ফিরেছে, ধুলোবালি মুছে গিয়ে দিব্য চাকচিক্য দেখা দিয়েছে। যারা সকালে বিকালে হোস পাইপে রাস্তার জল ছিটোয়, বোঝা গেল, তাদেরই কারুর স্নেহদৃষ্টি এর ওপর পড়েছিল। ওর চেহারার শ্রীবৃদ্ধি দেখে সুখী হলাম।

—ব্যাপার কিরকম বুঝচেন?

হঠাৎ পেছন থেকে প্রশ্নাহত হয়ে ফিরে তাকালাম। সেদিনের সেই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সেই থেকেই এখানে পাহারা দিচ্ছেন নাকি? না, কোনো প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ পেলেন?

—না না, তা কেন? এই পথেই আমার যাতায়াত কিনা!

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতে পারেন।

—নুড়িটা দেখছি আছে ঠিক। কেউ নেবে না—কি বলেন?

প্রশ্নটা এইভাবে করলো যেন যে-রকম দামী জিনিসটা পথে পড়ে আছে অমন আর ভূভারতে কোথাও মেলে না এবং ওর গুপ্তশত্রুর দল ওটাকে আত্মসাৎ করবার মতলবে ঘোরতর চক্রান্তে লিপ্ত; ছোঁ মেরে লুফে নেবার তালে হাত বাড়িয়ে সবাই যেন লোলুপ। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম—না না, আপনার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত, সরকার বাহাদুর

তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাঁচীর অতিথিশালায় সযত্নে রেখে দিয়েছেন, তাছাড়া, আপনি নিজেই যখন এদিকে কড়া নজর রেখেছেন তখন তো চিন্তা করার কিছু দেখিনে।

সে একটু হেসে বলল—আপনার যেমন কথা! দেখেছেন এদিকে কারা ওর পূজার্চনা করে গেছে?

ভালো করে নিরীক্ষণ করি—সত্যিই, দেখিনি তো, এক বেলার মধ্যেই কারা এসে পাথরটার সর্বাঙ্গে বেশ করে তেলসিঁদুর লেপে দিয়ে গেছে।

আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম—ভালোই হয়েছে! এতদিনে তবু ওর কান্তি ফিরলো এবং আরেকটি সমঝদার জুটলো!

পাথরটার সমাদরে পুলকিত হবার কথা, কিন্তু লোকটিকে বেশ ঈর্ষান্বিত দেখলাম। কপাল কুঁচকে সে বললে—সেই তো ভয়! সেই সমঝদার না ইতিমধ্যে ওটিকে সরিয়ে ফ্যালে!

পরদিন সকালে উঠে দেখি কোথাও পাথরটার চিহ্নমাত্র নেই। ওর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য হলাম খুব! কে ওটাকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের অযাচিত উদয় হোলো মনে কিন্তু কোনো সঠিক সদুত্তর পাওয়া গেল না। পাথরটার এরূপ অনুপস্থিতিতে এই পথে হরদম যাতায়াতকারী সেই লোকটি যে প্রাণে বেজায় ব্যথা পাবে অনুমান করা কঠিন নয়। একথা ভেবে লোকটার জন্য একটু দুঃখই জাগলো; —কিম্বা, এ সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই কর্মযোগ?

অনেকদিন পরে গলির মোড়ের অশথতলা দিয়ে আসছি—ও হরি! এখানে নুড়িটাকে নিয়ে এসেছে যে! নুড়ির স্থূল অঙ্গটা গাছের গোড়ায় এমন ভাবে পুঁতেছে যে, উপরের উদ্ধৃত গোলাকার নিটোল মসৃণ অংশ দেখে শিবলিঙ্গ বলে ওকে সন্দেহ হতে পারে। এই প্রয়োগ-নৈপুণ্য যার, তাকে বাহাদুরি দিতে হয়। নুড়িটার চারিদিকে ফুল বেলপাতা আতপ-চালের ছড়াছড়ি। সকালের দিকে এই পথে যে সব পুণ্যলোভী গঙ্গা স্নানে যায়, তারাই ফেরার পথে সস্তায় পারলৌকিক পাথেয়-সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ-রূপে একে গ্রহণ করেছে সহজেই বোঝা গেল। যাই হোক, মহাসমারোহেই ইনি এখানে বিরাজ করছেন—অতঃপর এঁর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারু দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণ নেই।

নুড়িটার এই পদোন্নতিতে আন্তরিক খুশি হলাম। আমিই একদিন ওকে মুক্তি দিয়েছি, এখন সবাইকে ও মুক্তি বিতরণ করতে থাক—ওর গৌরব, সে-তো আমারই গর্ব। পৃথিবীর বুকে ওর জন্মদাতা আমি, এইজন্য মনে মনে পিতৃত্বের একটা পুলক অনুভব না করে পারলাম না! এবং কায়মনোবাক্যে ওকে আশীর্বাদ করলাম।

সেই লোকটাকে তার দেবতার সন্ধান দেব কিনা মাঝে মাঝে ভেবেছি। পথে ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু পাথরটার কথা ও আর পাড়ে না। পাথরটার পলায়নে ভেবেছিলাম ও মুহ্যমান হয়ে পড়বে, কিন্তু উলটে ওকে প্রফুল্লই দেখা গেল। এত বড় একটা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন ও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তখন আর ওকে উতলা করে তোলায় কি লাভ।

মাঝে মাঝে অশথতলার পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরি, লক্ষ্য করি, দিনকের দিন নুড়িটার মর্যাদা বাড়ছে। একদিন দেখলাম গোটাকতক সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়েছে, গাঁজার গন্ধ এবং বুম্‌বুম্‌ শব্দের ঠেলায় ওখান দিয়ে নাক কান বাঁচিয়ে যাওয়া দুষ্কর। ঘ্রাণ এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের ওপরে দস্তুরমতই অত্যাচার।

যখন সন্ন্যাসী জুটেছে তখন ভক্ত জুটতে দেরী হবে না এবং ভক্তির আতিশয্য অনতিবিলম্বেই ইট-কাঠের মূর্তি ধরে মন্দিররূপে অভ্রভেদী হয়ে দেখা দেবে। দেবতা তখন বিশেষভাবে বনেদী হবেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী হয়ে দাঁড়াবে।

এর কিছুদিন পরে একটা চিনির কলের ব্যাপারে কয়েক মাসের জন্য আমাকে চাম্পারণ যেতে হোলো। অশথতলার পাশ দিয়ে গেলেও চলে. ভাবলাম, যাবার আগে দেবতার অবস্থাটা দেখে যাই। যা অনুমান করেছিলাম তাই, সন্ন্যাসীর সমাগমে ভক্তের সমারোহ হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ আলোচনা অনুসরণে যা বুঝলাম তার মর্ম এই যে, ইনি হচ্ছেন ত্রিলোকেশ্বর শিব, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু, একেবারে পাতাল ফুঁড়ে ফেঁপে উঠেচেন—এ'র তল নেই। অতএব এ'র উপযুক্ত সম্বর্ধনা করতে হলে এখানে একটা মন্দির খাড়া না করলে চলে না।

একবার বাসনা হোলো, ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস সবাইকে ডেকে বলে দিই, কিন্তু জীবন-বীমা করা ছিল না এবং ভক্তি কতটা ভয়াবহ হতে পারে জানতাম, আর তা ছাড়া ট্রেনের বিলম্বও বেশি নেই—ইত্যাদি বিবেচনা করে নিরস্ত হলাম। সেই লোকটাকে খবর না দিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি, কেননা যতদূর ধারণা হয়, নুড়িটাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই তার অভিরুচি ছিল ; কিন্তু ইনি যে ভক্তের তোয়াক্কা না রেখেই স্বকীয় প্রতিভাবলে এবং স্বচেষ্টায় ইতিমধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, এই সংবাদে সে পুলকিত, কিম্বা মর্মাহত হোতো বলা কঠিন।

কয়েক মাস বাদে যখন ফিরলাম তখন অশথতলার মোড়কে আর চেনাই যায় না। ছোটখাট একটা মন্দির উঠেছে, শংখঘণ্টার আর্তনাদে

কান পাতা দায় এবং ভক্তের ভিড় ঠেলে চলা দুরূহ। কিন্তু সে কথা বলছি না, সবচেয়ে বিস্মিত হলাম সেই সঙ্গে আরেক জনের আবির্ভাবে, কেবলমাত্র আবির্ভাব নয়, কলেবর পরিবর্তন পর্যন্ত দেখে। মন্দিরের চত্বরে সেই লোকটা—প্রথমত, সেই আদি ও অকৃত্রিম উপাসক—গেরুয়া, তিলক এবং রুদ্রাক্ষের চাপে তাকে আর চেনাই যায় না এখন।

—একি ব্যাপার?

আমিই গায়ে পড়ে প্রশ্ন করলাম একদিন।

—আজ্ঞে, এই দীনই শিবের সেবায়েত।

লোকটি বিনীত ভাবে জবাব দেয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দিব্যি বিনিপুঁজির ব্যবসা ফাঁদা হয়েছে। এই জন্যেই বুঝি পাথরটার ওপর অত করে নজর রাখা হয়েছিল?

শিলাখণ্ডের প্রতি ওর প্রীতিশীলতা যে অহেতুক এবং একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল না, এটা জেনেই বোধকরি অকস্মাৎ ওর ওপর দারুণ রাগ হয়ে যায়, ভারি রূঢ় হয়ে পড়ি।

কানে আঙুল দিয়ে সে বলল—অমন বলবেন না। পাথর কি মশাই? শ্রীবিষ্ণু! সাক্ষাৎ দেবতা যে। ত্রিলোকেশ্বর শিব। উদ্দেশে সে নমস্কার জানায়।

আমি হেসে ফেললাম—ওর তল নেই, না?

এবার সে একটু কুণ্ঠিত হয়—ওরাই তো বলে।

—তুমি নিজে কী বলো? ওরা তো বলে নিচে যতই ক্রেন খুঁড়ে যাও না, টিউব-কলের মত ওই শিবলিঙ্গ বরাবর নেমে গেছে। কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

—কী জানি! তাই হয়তো হবে।

—কতদূর শেকড় নেমেছে খুঁড়ে দেখই না কেন একদিন?

জিভ কেটে লোকটা বলল—ওসব কথা কেন? ওতে অপরাধ হয়। বাবা রাগ করবেন—উনি আমাদের জাগ্রত।

—বটে? কিরকম জাগ্রত শুনি?

—এই ধরুন না কেন! এবার তো কলকাতায় দারুণ বসন্ত, টিকে নিয়ে কিছু করেই কিছু হচ্ছে না—

—য়্যাঁ, বলো কি, মহামারী না কি, জানতাম না তো!

—খবরের কাগজেই দেখবেন কিরকম লোক মরছে। কর্পোরেশন থেকে টিকে দেবার ত্রুটি নেই অথচ প্রত্যেক পাড়াতেই—। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ-পর্যন্ত কারু হয়নি দেবতার কৃপায়। আমরা কেউ টিকেও নিইনি, কেবল বাবার চন্নামেত্ত খেয়েছি। এ যদি জাগ্রত না হয় তবে জাগ্রত আপনি কাকে বলেন?

এবার কি জবাব দেব তা চিন্তা করবার সময় ছিল না। আগে একবার এই রোগে যা কষ্ট পেয়েছিলাম এবং যা করে বেঁচেছিলাম তাতে বাবা ত্রিলোকনাথের মহিমা তখন আমার মাথায় উঠেছে। "—আমি এখন চললুম। আমাকে এক্ষুণি টিকে নিতে হবে। আরেকদিন এসে গল্প করব।" বলে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে ধাবিত হলাম।

পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দাঁড় করিয়ে সে বললে—আরে, কোথায় চলেছো এমন হন্যে হয়ে?

—টিকে নিতে।

—টিকে নিয়ে তো ছাই হচ্ছে। টিকেয় কিসসু হয় না। তুমি বরং Veriolinum 200 এক ডোজ খাও গে, কিং কম্পানির থেকে—যদি টিকে থাকতে চাও। পরের হপ্তায় ঐ আরেক ডোজ, তারপরে আরেক—ব্যস, নিশ্চিন্দি। টিকে ফেল করেছে আকচার দেখা যায়, কিন্তু ভেরিওলিনাম—নেভার।

—বলো কি? জানতাম না তো।

—জানবে কোত্থেকে? কেবল ফোঁড়াফুঁড়ি এই তো জেনেছো! অন্য কিছুতে কি আর তোমাদের বিশ্বেস আছে? আমি হোমিওপ্যাথি প্রাকটিশ ধরেছি, আমি জানি।

—বেশ, তাই খাচ্ছি না হয়।

কিং কম্পানিতে গিয়ে এক ডোজ দু'শ শক্তির ভেরিওলিনাম গলাধঃকরণ করলাম। যাক, এতক্ষণে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া গেল। হালকা হতে পারলাম।

এর পরেই পথ দিয়ে উপরি উপরি কয়েকটা শবযাত্রা গেল—নিশ্চয় এরা বসন্ত রোগেই মরেছে? কী সর্বনাশ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, ওদের থেকে এইভাবে কত লক্ষ লক্ষই না বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। ভেরিওলিনাম রক্তে পোঁছতে না পোঁছতেই এতক্ষণে এই সব মারাত্মক রোগাণুর কাজ শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়! হাত পা শিটিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে—এই বিপদসংকুল বাতাসের নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

অতি সংক্ষিপ্ত এক টুকরো প্রাচীরপত্রে বিখ্যাত বসন্ত চিকিৎসক কোন এক কবিরাজের নাম দেখলাম। হোমিওপ্যাথি করা গেছে, কবিরাজিই বা বাকি থাকে কেন—যে উপায়েই হোক সবার আগে আত্মরক্ষা। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পোঁছতেই দেখলাম কয়েকজন মিলে খুব ধুমধাম করে প্রকাণ্ড একটা শিলে কী যেন বাঁটছেন। কবিরাজকে আমার অবস্থা বলতেই তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই যে বাঁটা হচ্ছে। কণ্টিকারির শেকড়—বেঁটে খেতে হয়। ওর মত বসন্তের অব্যর্থ প্রতিষেধক আর কিছু নেই মশাই!

ব্যবস্থামত, তাই এক তাল খেয়ে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসা গেল। গায়ে যেন জোর পাচ্ছিলাম না, মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, জ্বর জ্বর ভাব—বসন্ত হবার আগে এই রকমই নাকি হয়ে থাকে। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম—আজ আর কিছু খাব না, মা। দেহটা ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে মা বললেন—কী হয়েছে তোর ?

—হয়নি কিছু। বোধহয় হবে !······বসন্ত।

—বালাই ষাট্। বলতে নেই। তা কেন হতে যাবে ? এই হর্তুকির টুকরোটা হাতে বাঁধ দিকি। আমি তিরিশ বছর বাঁধছি, এই হাতে কত বসন্ত রোগীই তো ঘাঁটলাম, সেবা করলাম, কিন্তু বলতে নেই, এরই জোরে কোনোদিন হাম পর্যন্ত হয়নি—। নে ধর্ এটা তুই।

মা তাঁর হাতের তাগাটা খুলে দিলেন।

—তিরিশ বছরে একবারো হয়নি তোমার ? বলো কি ? দাও, দাও তবে। এতক্ষণ বলোনি কেন ? কিন্তু এই একটুকরোয় কি হবে ? রোগ যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাকে আস্ত একটা হর্তুকি দাও যদি তাতে আটকায়।

হর্তুকি তো বাঁধলুম, কিন্তু বিকালের দিকে শরীরটা বেশ ম্যাজম্যাজ করতে লাগলো। নিজেকে রীতিমত জ্বরজড়িত মনে হোলো। আয়না নিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম, মুখেও যেন দু'একটা ফুসকুড়ির মতো দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই বসন্ত, তবে আর বাঁচন নেই, মাকে ডেকে দেখালাম।

মা বললেন—মার অনুগ্রহ নয়—ব্রণ।

আমি বললাম—উঁহু। ব্রণ নয়, নিতান্তই মার অনুগ্রহ !

মা বললেন—অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস্ নে। ও কিছু না, সমস্ত দিন ঘরে বসে আছিস্ একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয় গে।

এরকম দারুণ ভাবনা মাথায় নিয়ে কি বেড়াতে ভালো লাগে ? লোকটা বলছিল, ওরা সবাই চরণামৃত খেয়ে নিরাপদ রয়েছে। আমিও তাই খাবো নাকি ? হয়তো বা চরণামৃতের বীজাণুধ্বংসী কোনো ক্ষমতা আছে, নেই যে, তা কে বলতে পারে ?···হ্যাঃ ওর যেমন কথা ! ওটা স্রেফ্ য়্যাকসিডেণ্ট—কলকাতার সব বাড়িতেই কিছু আর অসুখ হচ্ছে না। তাছাড়া মনের জোরে রোগ-প্রতিরোধের শক্তি জন্মায়—মারীরও যেখানে মার—সেই মনের জোরই ওদের পক্ষে একটা মস্ত সহায়—কিন্তু ওই যৎসামান্য পাথরটাকে দেবতাজ্ঞান করার মতো বিশ্বাসের জোর আমি পাবো কোথায় ?

এ সব যা-তা না করে সকালে টিকে নেওয়াই আমার উচিত ছিল, হয়তো তাতে আটকাতো। এখুনি গিয়ে টিকেটা নিয়ে ফেলব নাকি ? টিকে নিলে শুনেছি বসন্ত মারাত্মক হয় না, বড় জোর হাম হয়ে দাঁড়ায়।

আর হামে তেমন ভয়ের কিছু নেই—ওতো শিশুদের হামেশাই হচ্ছে। নাঃ, যাই মেডিকেল কলেজের দিকেই বেরিয়ে পড়ি।

টিকে নিয়ে অশথতলার পাশ দিয়ে ফিরতে লোকটার সকালের কথাগুলো মনে পড়ল। হয়তো ঠিকই বলেছে সে। সত্যিই এক জায়গায় গিয়ে আর কোনো জবাব নেই, সেখানে রহস্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। এই তো আজ বেঁচে আছি, কিন্তু কাল যদি বসন্তে মারা যাই তখন কোথায় যাবো ? শেকস্‌পীয়ারের সেই কথাটা—সেই স্বর্গমর্ত্য-হোরাশিও-একাকার-করা বাণী—না, একেবারে ফেলনা নয়। এই পৃথিবীর, এই জীবনের, সুদূর নক্ষত্রলোক এবং তার বাইরেও বহুধা বিস্তৃত অনন্ত জগতের কতটুকুই আমরা জানি ? কটা ব্যাপারেরই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারি ? যতোই বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ি না কেন, শেষে সেই অজ্ঞেয়ের সীমান্তে এসে সব ব্যাপারীকেই নতমুখে চুপ করে দাঁড়াতে হয়।

মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে আসতে ত্রিলোকনাথের উদ্দেশ্যে মনে মনে দণ্ডবৎ জানালাম। প্রার্থনা করলাম, বাবা, আমার মূঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এযাত্রা।

খানিক দূর এগিয়ে এসে ফিরলাম আবার। নাঃ, দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া কিছু নয়। মুখের ফুসকুড়িগুলো হাত দিয়ে আঁচ করা গেল। —এগুলো ব্রণ, না বসন্ত ?

এবার মাটিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম—জয় বাবা ত্রিলোকনাথ ! রক্ষা করো বাবা ! বম্‌ বম্‌ !

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম কেউ দেখে ফ্যালেনি তো ?

ক্লাস ফ্রেন্ড

সত্যজিৎ রায়

সকাল সোয়া নটা।

মোহিত সরকার সবেমাত্র টাইয়ে ফাঁসটা পরিয়েছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী অরুণা ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোমার ফোন'।

'এই সময় আবার কে?'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় অফিসে পৌঁছানর অভ্যাস মোহিত সরকারের; ঠিক বেরোনর মুখে ফোন এসেছে শুনে স্বভাবতই তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

অরুণাদেবী বললেন, 'বলছে তোমার ইস্কুলে পড়ত।'

'ইস্কুলে? বোঝ!—নাম বলেছে?'

'বলল জয় বললেই বুঝবে!'

ত্রিশ বছর আগে ইস্কুল ছেড়েছেন মোহিত সরকার। ক্লাসে ছিল জনা চল্লিশকে ছেলে। খুব মন দিয়ে ভাবলে হয়ত তাদের মধ্যে জনা বিশেকের নাম ও চেহারা মনে পড়বে, আর সেই সঙ্গে চেহারাও। জয় বা জয়দেবের নাম ও চেহারা দুটোই ভাগ্যক্রমে মনে আছে, কারণ সে ছিল ক্লাসে সেরা ছেলেদের মধ্যে একজন। পরিষ্কার ফুট ফুটে চেহারা, পড়াশুনায় ভালো, ভালো হাইজাম্প দিত, ভালো তাসের ম্যাজিক দেখাত, ক্যাসাবিয়াঙ্কা আবৃত্তি করে একবার মেডেল পেয়েছিল। স্কুল ছাড়ার পরে তার আর কোনো খবর রাখেন নি মোহিত সরকার। তিনি এখন বুঝতে পারলেন যে এককালে বন্ধুত্ব থাকলেও এত কাল ছাড়াছাড়ির পর তিনি আর কোনো টান অনুভব করছেন না তাঁর ইস্কুলের সহপাঠীর প্রতি।

মোহিত অগত্যা টেলিফোনটা ধরলেন।

'হ্যালো।'

'কে মোহিত? চিনতে পারছ ভাই? আমি সেই জয়—
জয়দেব বোস। বালিগঞ্জ স্কুল।'

'গলা চেনা যায় না, তবে চেহারাটা মনে পড়ছে। কী ব্যাপার?'

'তুমি তো এখন বড় অফিসার ভাই; নামটা যে মনে রেখেছ এটাই খুব!'

'ওসব থাক—এখন কী ব্যাপার বল।'

'ইয়ে, একটু দরকার ছিল। একবার দেখা হয়?'

'কবে?'

'তুমি যখন বলবে। তবে যদি তাড়াতাড়ি হয় তাহলে.....'

'তাহলে আজই কর। আমার ফিরতে ফিরতে ছ'টা হয়। সাতটা নাগাদ আসতে পারবে?'
নিশ্চয়ই পারব। থ্যাঙ্কইউ ভাই। তখন কথা হবে।'

হালে কেনা হালকা নীল স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে আপিস যাবার পথে মোহিত সরকার ইস্কুলের ঘটনা কিছু মনে আনার চেষ্টা করলেন। হেডমাস্টার গিরীন সুরের ঘোলাটে চাহনি আর গুরুগম্ভীর

মেজাজ সত্ত্বেও স্কুলের দিনগুলি ভারী আনন্দের ছিল। মোহিত নিজেও ভাল ছাত্র ছিলেন। শঙ্কর, মোহিত আর জয়দেব—এই তিনজনের মধ্যেই রেশারেশি ছিল। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনজনে যেন পালা করে হত। ক্লাস সিক্স থেকে মোহিত সরকার আর জয়দেব বোস একসঙ্গে পড়েছেন। অনেক সময় এক বেঞ্চিতেই পাশপাশি বসতেন দুজন। ফুটবলেও পাশাপাশি স্থান ছিল দুজনের; মোহিত খেলতেন রাইট-ইন, জয়দেব রাইট-আউট; তখন মোহিতের মনে হত এই বন্ধুত্ব বুঝি চিরকালের। কিন্তু ইস্কুল ছাড়ার পরেই দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। মোহিতের বাবা ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক, কলকাতার নাম করা ব্যারিস্টার। ইস্কুল শেষ করে মোহিত ভালো কলেজে ঢুকে ভালো পাশ করে দু'বছরের মধ্যে ভালো সদাগরী আপিসে চাকরি পেয়ে যায়। জয়দেব চায় অন্য শহরে অন্য কলেজে, কারণ তার বাবার ছিল বদলীর চাকরি। তারপর, আশ্চর্য ব্যাপার, মোহিত দেখেন যে তিনি আর জয়দেবের অভাব বোধ করছেন না; তার জায়গায় নতুন বন্ধু জুটেছে কলেজে। তারপর সেই বন্ধু বদলে গেল যখন ছাত্রজীবন শেষ করে মোহিত চাকরির জীবনে প্রবেশ করলেন। এখন তিনি তাঁর আপিসের চারজন মাথার মধ্যে একজন; এবং তাঁর সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হল তাঁরই একজন সহকর্মী। স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র প্রজ্ঞান সেনগুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্লাবে দেখা হয়; সেও ভালো আপিসে বড় কাজ করে। আশ্চর্য, ইস্কুলের স্মৃতির মধ্যে কিন্তু প্রজ্ঞানের কোনো স্থান নেই। অথচ জয়দেব—যার সঙ্গে ত্রিশ বছর দেখাই হয়নি—স্মৃতির অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। এই সত্যটা মোহিত পুরানো কথা ভাবতে ভাবতে বেশ ভালো করে বুঝতে পারলেন।

মোহিতের অফিসটা সেন্ট্রাল এভিনিউতে।চৌরঙ্গী আর সুরেন ব্যানার্জির সংযোগস্থলের কাছাকাছি আসতেই গাড়ির ভিড়, মোটরের হর্ন আর বাসের ধোঁয়া মোহিত সরকারকে স্মৃতির জগৎ থেকে হুড়মুড়িয়ে বাস্তব জগতে এনে ফেলল। হাতের ঘটিটার দিকে চোখ পড়াতে মোহিত বুঝলেন যে তিনি আজ মিনিট তিনেক লেট হবেন।

আফিসের কাজ সেরে সন্ধ্যায় তাঁর লী রোডের বাড়ীতে যখন ফিরলেন মোহিত, তখন তাঁর মনে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের স্মৃতির কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। সত্যি বলতে কী, তিনি সকালের টেলিফোনের কথাটাও বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন; সেটা মনে পড়ল যখন বেয়ারা বিপিন বৈঠকখানায় এসে তাঁর হাতে রুলটানা খাতার পাতা ভাঁজ করে ছেঁড়া একটা চিরকুট দিল। তাতে ইংরিজিতে লেখা—'জয়দেব বোস, অ্যাজ পার অ্যাপয়েন্টমেন্ট'।

রেডিওতে বি বি সি-র খবরটা বন্ধ করে মোহিত বিপিনকে বললেন, 'ভেতরে আসতে বল'—আর বলেই মনে হল, জয় এতকাল করে আসছে, তার জন্য কিছু খাবার আনিয়ে রাখা উচিত ছিল। আপিস-ফেরতা পার্ক ষ্ট্রীট থেকে কেক-পেস্ট্রি জাতীয় কিছু কিনে আনা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কিন্তু খেয়াল হয় নি। তাঁর স্ত্রী কি আর নিজে খেয়াল করে এ কাজটা করেছেন?

'চিনতে পারছ?'

গলার স্বর শুনে, আর সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অধিকারীর দিকে গলার স্বর শুনে, আর সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অধিকারীর দিকে চেয়ে মোহিত সরকারের যে প্রতিক্রিয়াটা হল সেটা সিঁড়ি উঠতে গিয়ে শেষ ধাপ পেরোনোর পরেও আরেক ধাপ মনে করে পা ফেললে হয়। চৌকাঠ পেরিয়ে

যিনি ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর পরনে ছাই রঙের বেখাপ্পা ঢলঢলে সুতির প্যান্টের উপর হাতাকাটা সস্তা ছিটের সার্ট দুটির কোনটিও কস্মিনকালে ইস্তিরির সংস্পর্শে এসেছে বলে মনে হয় না। সার্টের কলারের ভিতর দিয়ে যে মুখটি বেরিয়ে আছে তার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও মোহিত তাঁর স্মৃতির জয়দেবের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে ফেলেন না। আগন্তুকের চোখ কোটরে বসা, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে ঝামা, গাল তোবড়ানো; থুতনিতে অন্তত তিন দিনের কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার উপরাংশ মসৃণ, কানের পাশে কয়েকগাছা অবিন্যস্ত পাকাচুল। প্রশ্নটা হাসিমুখে করায় ভদ্রলোকের দাঁতের পার্টিও দেখতে পেয়েছেন মোহিত সরকার, এবং মনে হয়েছে পান-খাওয়া ক্ষয়ে-যাওয়া অমন দাঁত নিয়ে হাসতে হলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসা উচিত।

'অনেক বদলে গেছি, না?'

'বোসো।'

মোহিত এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামনের সোফায় আগন্তুক বসার পর মোহিতও তাঁর নিজের জায়গায় বসলেন। মোহিতের নিজের ছাত্রজীবনের কয়েকটা ছবি তাঁর অ্যালবামে আছে; সেই ছবিতে চোদ্দ বছর বয়সের মোহিতের সঙ্গে আজকের মোহিতের আদল বার করতে অসুবিধা হয় না। তাহলে এঁকে চেনা এক কঠিন হচ্ছে কেন? ত্রিশ বছরে একজনের চেহারায় এত পরিবর্তন হয় কি?

'তোমাকে কিন্তু বেশ চেনা যায়। রাস্তায় দেখলেও চিনতে পারতাম'—ভদ্রলোক কথা বলে চলেছেন—'আসলে আমার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কলেজে পড়তে পড়তে বাবা মারা গেলেন, আমি পড়া ছেড়ে চাকরির ধান্দায় ঘুরতে শুরু করি। তারপর, ব্যাপার তো বোঝাই। কপাল আর ব্যাকিং এ দুটোই যদি না থাকে তাহলে আজকের দিনে একজন ইয়ের পক্ষে....'

'চা খাবে?'

'চা? হ্যাঁ, তা....

মোহিত বিপিনকে ডেকে চা আনতে বললেন, আর সেই সঙ্গে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে কেক মিষ্টি যদি নাও থাকে তাহলেও ক্ষতি নেই; এনার পক্ষে বিস্কুটই যথেষ্ট।

'ওঃ।'—ভদ্রলোক বলে চলেছেন, 'আজ সারাদিন ধরে কত পুরানো কথাই না ভেবেছি, জান মোহিত!'

মোহিত নিজেও যে কিছুটা সময় তাই করেছেন সেটা আর বললেন না।

'এল সি এম, জি সি এম-কে মনে আছে?'

মোহিতের মনে ছিল না, কিন্তু বলতেই মনে পড়ল। এল সি এম হলেন পি-টির মাস্টার লাল চাঁদ মুখুজ্যে। আর জি সি এম হলেন অঙ্কের স্যার গোপেন মিত্তির।

'আমাদের খাবার জলের ট্যাঙ্কের পেছনটায় দুজনকে জোর করে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে কে বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলেছিল মনে আছে?'

ঠোঁটের কোনে একটা হালকা হাসি এনে মোহিত বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর মনে আছে। আশ্চর্য, এগুলো তো সবই সত্যি কথা। ইনি যদি জয়দেব না হন তাহলে এত কথা জানলেন কী করে?

'স্কুল লাইফের পাঁচটা বছরই আমার জীবনের বেস্টটাইম, জান ভাই,' বললেন আগন্তুক, 'তেমন দিন আর আসবে না।'

মোহিত একটা কথা না বলে পারলেন না।

'তোমার তো মোটামুটি আমারই বয়স ছিল বলে মনে পড়ে'—

'তোমার চেয়ে তিন মাসের ছোট।'

'—তাহলে এমন বুড়োলে কী করে? চুলের দশা এমন হল কী করে?'

'স্ট্রাগ্‌ল, ভাই স্ট্রাগ্‌ল,' বললেন আগন্তুক। 'অবিশ্যি টাকটা আমাদের ফ্যামেলির অনেকেরই আছে। বাপ-ঠাকুর্দা দুজনেরই টাক পড়ে যায় পঁয়ত্রিশের মধ্যে! গাল ভেঙেছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জন্য, আর প্রপার ডায়েটের অভাবে। তোমাদের মতো তো টেবিল চেয়ারে বসে কাজ নয় ভাই। কারখানায় কাজ করেছি সাত বছর, তারপর মেডিক্যাল সেলসম্যান, ইনশিওরেন্সের দালালি, এ দাললি, সে দালালি! এক কাজে টিকে থাকব সে তো আর কপালে লেখা নেই। তাঁতের মাকুর মতো একবার এদিক একবার ওদিক। কথায় বলে—শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়— অথচ তাতে শেষ অবধি শরীরটা গিয়ে কী দাঁড়ায় তা তো আর বলে না। সেটা আমায় দেখে বুঝতে হবে।'

বিপিন চা এনে দিল। সঙ্গেঁ প্লেটে সন্দেশ আর সিঙ্গাঁড়া। গিন্নীর খেয়াল আছে বলতে হবে। ক্লাস ফ্রেণ্ডের এই ছিরি দেখলে কী ভাবতেন সেটা মোহিত আন্দাজ করতে পারলেন না।

'তুমি খাবে না?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন। মোহিত মাথা নাড়লেন।— 'আমি এই মাত্র খেয়েছি।'

'একটা সন্দেশ?'

'নাঃ, আপ— তুমিই খাও।'

ভদ্রলোক সিঙ্গাঁড়ায় কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতেই বললেন, 'ছেলেটার পরীক্ষা সামনে। অথচ এমন দশা, জান মোহিত ভাই, ফী-এর টাকাটা যে কোত্থেকে আসবে তা তো বুঝতে পারছি না।'

আর বলতে হবে না। মোহিত বুঝে নিয়েছেন। আগেই বোঝা উচিত ছিল এঁর আসার কারণটা। সাহায্য প্রার্থনা। আর্থিক সাহায্য কত চাইবেন? বিশ-পঁচিশ হলে দিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ না দিলেই যে উৎপাতের শেষ হবে এমন কোনো ভরসা নেই।

'আমার ছেলেটা খুব ব্রাইট, জান ভাই। পয়সার অভাবে তার পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এ কথাটা ভেবে আমার রাতে ঘুম হয় না।'

দ্বিতীয় সিঙ্গাঁড়াটাও উঠে গেল প্লেট থেকে। মোহিত সুযোগ পেলেই জয়দেবের সেই ছেলে বয়সের চেহারাটার সঙ্গে 'আগন্তুকের চেহারা মিলিয়ে দেখছেন, আর ক্রমেই তাঁর বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে যে সেই বালকের সঙ্গেঁ এই প্রৌঢ়ের কোনো সাদৃশ্য নেই।

'তাই বলছিলাম, ভাই,' চায়ে সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন আগন্তুক, 'অন্তত শ'খানেক কি শ'দেড়েক যদি এই পুরানো বন্ধুর হাতে তুলে দিতে পার, তাহলে—'

'ভেরি সরি।'

'অ্যাঁ?'

টাকার কথাটা উঠলেই সরাসরি না করে দেবেন এটা মোহিত মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এখন মনে হল ব্যাপারটা এতটা রূঢ়ভাবে না করলেও চলত। তাই নিজেকে খানিকটা

শুধরে নিয়ে গলাটাকে আরেকটু নরম করে বললেন, 'সরি ভাই। আমার কাছে জাস্ট নাউ ক্যাশের একটু অভাব।'

'আমি কাল আসতে পারি। এনি টাইম। তুমি যখনই বলবে।'

'কাল আমি একটু কলকাতার বাইরে যাব। ফিরব দিন তিনেক পরে। তুমি রোববার এস।'

'রবিবার......'

আগন্তুক যেন খানিকটা চুপসে গেলেন। মোহিত মনস্থির করে ফেলেছেন। ইনিই যে জয়, চেহারায় তার কোনো প্রমাণ নেই। কলকাতার মানুষ ধাপ্পা দিয়ে টাকা রোজগারের হাজার ফিকির জানে। ইনি যদি জালিয়াতি হন? হয়ত আসল জয়দেবকে চেনেন। তার কাছ থেকে ত্রিশ বছর আগের বালিগঞ্জ স্কুলের কয়েকটা ঘটনা জেনে নেওয়া আর এমন কী কঠিন কাজ?

'রবিবার কখন আসব?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

'সকালের দিকেই ভাল। এই নটা সাড়ে নটা।'

শুক্রবার ঈদের ছুটি। মোহিতের আগে থেকেই ঠিক আছে বারুইপুরে এক বন্ধুর বাগান বাড়িতে সস্ত্রীক গিয়ে উইক-এণ্ড কাটিয়ে আসবেন। দুদিন থেকে রবিবার রাত্রে ফেরা; সুতরাং ভদ্রলোক সকালে এলে তাঁকে পাবেন না। এই প্রতারণাটুকুও প্রয়োজন হত না যদি মোহিত সোজাসুজি মুখের উপর না করে দিতেন। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের দ্বারা এ জিনিষটা হয় না। মোহিত এই দলেই পড়েন। রবিবার তাঁকে না পেয়ে যদি আবার আসেন ভদ্রলোক, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করার কোনো অজুহাত বার করবেন মোহিত সরকার। তারপর হয়ত আর বিরক্ত হতে হবে না।

আগন্তুক চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রাখতেই ঘরে আরেকজন পুরুষ এসে ঢুকলেন। ইনি মোহিতের অন্তরঙ্গ বন্ধু বাণীকান্ত সেন। আরো দু'জন আসার কথা আছে, তারপর তাসের আড্ডা বসবে। এটা রোজকার ঘটনা। বাণীকান্ত ঘরে ঢুকেই যে আগন্তুকের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিলেন সেটা মোহিতের দৃষ্টি এড়ান না। আগন্তুকের সঙ্গে বন্ধুর পরিচয়ের ব্যাপারটা মোহিত অম্লান বদনে এড়িয়ে গেলেন।

'আচ্ছা, তাহলে আসি...' আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'তুই এই উপকারটা করলে সত্যিই গ্রেটফুল থাকব ভাই, সত্যিই।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পর মুহূর্তেই বাণীকান্ত বন্ধুর দিকে ফিরে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'এই লোক তোমাকে তুই করে বলছে— ব্যাপারটা কী?'

'এতক্ষণ তুমি বলছিল, শেষে তোমাকে শুনিয়ে হঠাৎ তুই বলল।'

'লোকটা কে?'

মোহিত উত্তর না দিয়ে বুক শেল্‌ফ থেকে একটা পুরানো ফোটো অ্যালবাম বার করে তার একটা পাতা খুলে বাণীকান্তর দিকে এগিয়ে দিল।

'একি তোমার ইস্কুলের গ্রুপ নাকি?'

'বোট্যানিক্‌সে পিকনিকে গিয়েছিলাম,' বললেন মোহিত সরকার।

'কারা এই পাঁচজন?'

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'দাঁড়াও, দেখি।'

অ্যালবামের পাতাটাকে চোখের কাছে নিয়ে বাণীকান্ত সহজেই তাঁর বন্ধুকে চিনে ফেললেন।

'এবার আমার ডানপাশের ছেলেটিকে দেখ তো ভালো করে!' ছবিটাকে আরো চোখের কাছে এনে বাণীকান্ত বললেন, 'দেখলাম।'

মোহিত বললেন, 'ইনি হচ্ছেন যিনি এইমাত্র উঠে গেলেন।'

'ইস্কুল থেকেই কি জুয়া ধরেছিলেন নাকি?'— অ্যালবামটা সশব্দে বন্ধ করে পাশের সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করলেন বাণীকান্ত।

—'ভদ্রলোককে অন্তত বত্রিশবার দেখেছি রেসের মাঠে।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' বললেন মোহিত সরকার। তারপর আগন্তুকের সঙ্গে কী কথা হল সেটা সংক্ষেপে বললেন।

'পুলিশে খবর দে,' বললেন বাণীকান্ত, 'চোর জোচ্চোর জালিয়াতের ডিপো হয়েছে কলকাতা শহর। এই ছবির ছেলে আর ওই জুয়াড়ি এক লোক হওয়া ইম্পসিবল।'

মোহিত হালকা হাসি হেসে বললেন, 'রোববার এসে আমাকে না পেলেই ব্যাপারটা বুঝবে। তারপর আর উৎপাত করবে বলে মনে হয় না।'

বারুইপুরে বন্ধুর পুকুরের মাছ, পোলট্রির মুরগীর ডিম, আর গাছের আম জাম ডাব পেয়ারা খেয়ে, বকুল গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি পেতে বুকে বালিস নিয়ে তাস খেলে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করে রবিবার রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে মোহিত সরকার বিপিন বেয়ারার কাছে শুনলেন যে সেদিন যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি আজ সকালে আবার এসেছিলেন। —'যাবার সময় কিছু বলে গেছেন কি?'

'আজ্ঞে না,' বলল বিপিন।

যাক্, নিশ্চিন্ত! একটা সামান্য কৌশল, কিন্তু তাতে কাজ দিয়েছে অনেক। আর আসবে না। আপদ গেছে।

কিন্তু না। আপদ সেদিনের জন্য গেলেও, পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ মোহিত যখন বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তখন বিপিন আবার একটি ভাঁজ করা চিরকুট এনে দিল তাকে। মোহিত খুলে দেখলেন তিন লাইনের একটি চিঠি।

ভাই মোহিত,

আমার ডান পা-টা মচকেছে, তাই ছেলেকে পাঠাচ্ছি। সাহায্য স্বরূপ সামান্য কিছুও এর হাতে দিলে অশেষ উপকার হবে। আশা করি হতাশ করবে না।—

ইতি জয়

মোহিত বুঝলেন এবার আর রেহাই নেই। তবে সামান্য মানে সামান্যই, এই স্থির করে তিনি বেয়ারাকে বললেন, 'ডাক ছেলেটিকে।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটি তেরো—চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে দরজা দিয়ে ঢুকে মোহিতের দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে আবার কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিত তার দিকে মিনিট খানেক চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'বোস।'

৭

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ ভাব করে একটি সোফার এক কোণে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে বসল।

'আমি আসছি এক্ষুনি।'

মোহিত দোতলায় গিয়ে স্ত্রীর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে আলমারি খুলে দেরাজ থেকে চারটে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে একটা খামে পুরে আলমারি বন্ধ করে আবার নিচের বৈঠকখানায় ফিরে এলেন।

'কী নাম তোমার ?'

'শ্রী সঞ্জয় কুমার বোস।'

'এতে টাকা আছে। সাবধানে নিতে পারবে ?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কোথায় নেবে ?'

'বুক পকেটে।'

'ট্রামে ফিরবে, না বাসে ?'

'হেঁটে।'

হেঁটে ? কোথায় বাড়ি তোমার ?'

'মির্জাপুর স্ট্রীট।'

'এত দূর হাঁটবে ?'

'বাবা বলেছেন হেঁটে ফিরতে।'

'তার চেয়ে এক কাজ কর। ঘন্টা খানেক বোস, চা-মিষ্টি খাও, অনেক বই-টই আছে, দেখ— আমি ন'টায় অফিসে যাব, আমায় নামিয়ে দিয়ে আমার গাড়ি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে। তুমি বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারবে তো ?'

ছেলেটি আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মোহিত বিপিনকে ডেকে ছেলেটির জন্য চা দিতে বলে আপিসে যাবার জন্য তৈরী হতে দোতলায় রওনা হলেন।

ভারী হালকা বোধ করছেন তিনি, ভারী প্রসন্ন।

জয়কে দেখে না চিনলেও, তিনি তার ছেলে সঞ্জয়ের মধ্যে তাঁর ত্রিশ বছর আগের ক্লাস ফ্রেণ্ডটিকে ফিরে পেয়েছেন।

কবিতা

দুরন্ত আশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে
তখনো ভালোমানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে !
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোষে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি—
গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন !

চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

বিপদ-মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে—
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি
বাজাও ওকি সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপুর!
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিকাল তর্ক করে,
জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে
বাতাস ঝুরুঝুরু।
পানের বাটা, ফুলের মালা,
তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভ-ভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর!

কিসের এত অহংকার!
দম্ভ নাহি সাজে
বরং থাকো মৌন হয়ে
সসংকোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্ত-পারা
কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহমাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর!
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর
পূর্ব পুরুষের,

আর্যতেজদর্পভরে
পৃথ্বী থরথর!

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে—
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে
শান্তি নাহি মানি।

মৃত্যুঞ্জয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা!
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরু দুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটি ভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,
নামিল আঘাত।

পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে নাকি
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত ?'
নামিল আঘাত।

এইমাত্র ? আর-কিছু নয় ?
ভেঙ্গে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমিতো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

জুতা-আবিষ্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কহিলা হবু, 'শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র,
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী মাঝে চরণ ফেলামাত্র ?
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি !

শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।'

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুন ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে—
'যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে,
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!'

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি
কহিল শেষে 'কথাটা বটে সত্য—
কিন্তু আগে বিদায় কর ধুলি
ভাবিয়ো পরে পদধুলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেনবা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে?
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হ'বে শস্য!'
কহিলা রাজা 'তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছে কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য্য,
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা 'করিতে ধুলা দূর
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর!'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা 'এমনি সব গাধা
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা!'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোন রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলাতো লাগে না।'

কহিল রাজা 'সে কথা বড়ো খাঁটি—
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।'

কহিল সবে 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি'।
কহিল সবে 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমত চামার যদি মেলে'।

রাজার চর ধাইল হেথা-হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
না মিলে এত উচিতমতো চর্ম।
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।

কহিল রাজা 'এত কি হবে সিধে!
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশ শুদ্ধ।
মন্ত্রী কহে 'বেটারে শূলে বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ'।
রাজার পদ চর্ম আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে 'আমারো ছিল মনে—
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।'
সেদিন হতে চলিল জুতা পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

সাঁওতাল মেয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে
শিমুলগাছের তলে কাঁকরবিছানো পথ বেয়ে।
মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্ কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।

ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।
নিটোল দু হাতে তার সাদারাঙা কয় জোড়া
গালা-ঢালা চুড়ি,
মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি,
যাওয়া-আসা করে বারবার।
আঁচলের প্রান্ত তার
লাল রেখা দুলাইয়া
পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।

পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের ক্বচিৎ আবেশ।
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।
আমলকীতলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।

আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া গাঁথা,
অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলাফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।
ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে
রৌদ্রে পিঠ পেতে।

মাঝে মাঝে
সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে;
প্রহর চলিয়া যায়, বেলা পড়ে আসে,
ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত-আকাশে।
আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি,—এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি,—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই ;
মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই ?
পুকুর ধা'রে নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
মাগো আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই ?

সেদিন হতে কেন মা আর দিদিরে নাহি ডাকো ;
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে ডাকি তখন,
'ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো ?
আমি ডাকি তুমি কেন চুপটি করে থাকো ?

বলু মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে !
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে ?
আমিও নাই দিদিও নাই—কেমন মজা হবে।

ভুঁইচাপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল !
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিসনা তারে উড়িয়ে মা গো ছিঁড়তে গিয়ে ফল,
দিদি এসে শুনবে যখন বলবে কি মা বল ?

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই।
এমন সময় মাগো আমার কাজলা দিদি কই ?
বেড়ার ধারে পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতো জেগে রই।
রাত হ'ল যে মাগো, আমার কাজলা দিদি কই ?

বিড়াল চাটে দুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা,
পিঁপড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নির্জ্জলা
তারাই শুধু হাতের চেটো মেলছে মেঝের পরে।
তৃষ্ণাতে জিভ টানছে পেটে, এমনি রোদের তাত,
খসখসে দুই চোখের পাতা, হয় না অশ্রুপাত।

ফোঁটায় ফোঁটায় শিবের মাথায় ঝারার যে জল ঝরে—
সতৃষ্ণ চোখ সারা বেলা দেখছে শুধু তাই,
কাকটা কখন গুটি গুটি ঢুকে ঠাকুর-ঘরে
অর্ঘ্যপাত্রে মুখ দে' গেল,—একটুও হুঁশ নাই।
চক্ষু দিয়ে প্রাণ-পাখী হায় মেলছে বুঝি পাখা,
ভির্মি গেছে—ভির্মি গেছে—জল কে দেবে মুখে?

কারো সাড়া নেইকো কোথাও মিথ্যে হাঁকা ডাকা—
একাদশীর বিধান-দাতার গর্জ্জে নাসা সুখে।
অধোমুখে বিশ্ব দ্যাখে, হায় গো বিশ্বনাথ,
পাষাণ 'পরে অশ্রু ঝরে পড়ে দিবসরাত।

চম্পা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি' ;
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মূহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, ঊষার আতপ্ত কর ধরি' ;
মূর্চ্ছে দেহ মোহে মন,—মুহুর্মুহুঃ করি অনুভব !
সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্য্যের সৌরভ।

কৃষ্ণা রজনী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বুঝি সেদিন, সজনি, এমনি রজনী আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর ঝটিকা-মুখর চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃতপতি কোলে,
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কত কথা বলে, চমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সেদিন, সজনি, এমনি রজনী আঁধিয়ার।

২

বুঝি সেদিনও এমনি গুরুগর্জ্জন অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ-রাজ্য টলমল।
গাঙ্গুড়ের নীরে ভাসাইয়া ভেলা
মৃতপতি-দেহ আবরি বেহুলা
চলে অসহায়া একাকিনী বালা, ঝরে অবিরত আঁখিজল,
বুঝি সেদিনও এমনি গুরুগর্জ্জন অবিরল।

৩

বুঝি সেদিনও এমনি আকাশে বিজলী ঝলকায়
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে চমকায়।
বারাণসীধামে গঙ্গার তীরে
ধূলিলুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে মৃতপুত্রের মুখ কায়,
বুঝি সেদিনও এমনি আকাশে বিজলী ঝলকায়।

৪

বুঝি সেদিনও এমনি জলের আকুল কলকল,
বনমর্ম্মরে ত্রস্ত চকিত মৃগদল।
দময়ন্তীরে ফেলি' বনমাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ, মলিন বদন-শতদল
বুঝি সেদিনও এমনি জলের আকুল কলকল।

৫

তার মনে মিশি'আছে নিশি কত হাহাকার,
কত শ্মশানের অঙ্গার, কত আঁখিধার।
শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি'
তাহার আঁধার রাখিয়াছে গড়ি,'
কত সুষমার কত চিতা মরি নিভেছে জ্বলেছে বারবার!
তার সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার॥

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূরের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে ওঠে দীপ—আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত-না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল-চেনাচিনি, দর-জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে, কেউ গেল খালি ফিরে ;
দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশিরবিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা !

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা !
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা !

নোট বুক

সুকুমার রায়

এই দেখ পেনসিল নোটবুক এ-হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিলবিল লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট্‌পট্ লিখি তায়,
ফড়িঙের কটা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায় ;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্,
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্।
দেখে শিখে পড়ে শুনে বসে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি-এ।
কান করে কট্‌কট্ ফোড়া করে টন্‌টন্—
ওরে রামা ছুটে আয় নিয়ে আয় লণ্ঠন।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা,
ঝোলাগুড় কিসে দেয় ? সাবান না পট্‌কা—
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে,
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কামড়ায় বল দেখি পার কে ?
বল দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরোকে ?
তেজপাতে তেজ কেন ? ঝাল কেন লঙ্কায় ?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায় ?
কার নাম দুন্দুভি, কাকে বলে অর্ণব ?
বলবে কি, তোমরা ও নোট বই পড়নি !

কাল বৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে !
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে !
কানন-আনন পাণ্ডুর করি
জলস্থলের নিশ্বাস হরি
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে !

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গনিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি তুলিয়াছে প্রাণ ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ ?

হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীমকুণ্ডল জটা !
অথবা ও কি রে সচল অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মিছটা !

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার।
শুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব—নাসা-গর্জন ঝঞ্ঝার
পিঙ্গল হল গলতলদেশ,
ধূলিধূসরিত উন্মাদবেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার।

অংকুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক্ হতে দিক্-অন্তে !
দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে।
বাজে ঘন ঘন রণ দুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি,
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে !

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন ?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন ?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘকজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হল ছিন্ন।

হেরো, ফিরে চলে সে রণবাহিনী বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্মল হল—ধৌত ধরার পঙ্ক।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে
নদী উথলিছে কুলকুলু ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বসে নিঃশঙ্ক।

নববর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে।
হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি—
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অংকুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি—তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির।

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি ধরায় ধরে না হর্ষ
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া,
নিশীথনীরব ঘনঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।

চাঁদ সদাগর

কালিদাস রায়

দেবতা মন্দিরে ভরা   সিন্দুর চন্দনে গড়া
বাণী-তীর্থে উচ্চে তুলি শির,
তুমি দেবতারো বড়ো   এ যুগের অর্ঘ্য ধরো,
বন্দি সাধু চন্দ্রধর বীর।
এ বঙ্গের সমতলে   তৃণ-লতা-গুল্মদলে
বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি,
জ্ঞানায়ুধ সত্যভৃৎ   সর্পফণা-দর্পজিৎ
শালপ্রাংশু মহাভুজ রথী।
সান্তালী পর্বত 'পরে   হিন্তালের যষ্টি করে
দৃপ্ত-দীপ্ত তোমার পৌরুষ,
তোমা ঘেরি চারিপাশে   বাঁচে মরে কাঁপে ত্রাসে
কোটি কোটি ভীরু অমানুষ।
তব শিরে যমদণ্ড   ভেঙে হল সাত-খণ্ড,
পণ তব প্রাণেরো অধিক,
সাত পুত্র-শব 'পরি   শ্মশানেশ্বরেরে স্মরি
বামাচারী তুমি কাপালিক!
সনকার আর্তনাদে   চম্পকনগর কাঁদে,
ডুবে যায় চৌদ্দ মধুকর,
কৌপীন করিয়া সার   তোমার পুরুষকার
পথে পথে ফিরে দিগম্বর।
অশ্রুবিন্দু নাই চোখে   দুর্বিষহ মহাশোকে
নেত্র তব উগারে অনল,
শুধু তব জগদীশ   কণ্ঠে ধরেছেন বিষ,
সর্ব অঙ্গে তোমার গরল।
বিষে তনু নীলরুচি   আত্মা তব শুভ্র শুচি
নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্রোপম,
সহস্র ফণার মাঝে   তোমার পৌরুষ রাজে
নাগবৈরী বৈনতেয় সম।

হরিয়া নশ্বর ধন তোমা নিঃস্ব অকিঞ্চন
কে করিবে ? এত স্পর্ধা কার ?
পুরুষার্থ-শিরোমণি শাশ্বত ধনে যে ধনী
বিশ্বে সেই নমস্য সবার।
তোমারে করিতে বন্দী ব্যর্থ দেবতার ফন্দি
মানুষের সনে সন্ধি যাচে,
সর্ব বৈর দণ্ড-ভয় যে-জন করেছে জয়
দণ্ড-দাতা প্রার্থী তারি কাছে।
সারা বিশ্ব অসহায় নিয়তির জয় গায়
দাসীত্বে নোওয়াতে তার শির,
একাই বুঝিলে শৈব স্তম্ভিত দাম্ভিত দৈব,
কম্পমান পাষাণ-মন্দির।
যুগ যুগ ধরি যত মূক জীব অবিরত
দৈব-দণ্ড আসিয়াছে সহি,
তোমার মাঝারে সবি সংহত বিগ্রহ লভি
রুদ্রকণ্ঠে হল কি বিদ্রোহী ?
সহস্র বৎসর ধরি ভয়ে কাঁপে থরথরি
নরনারী যূপবদ্ধ ছাগ,
বজ্রমন্দ্রে তার মাঝে শুনাইলে দেবরাজে
"মানুষেরও চাই যজ্ঞভাগ।"
শিখাইলে এই সত্য তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব
দেব নয়, মানুষই অমর,
মানুষই দেবতা গড়ে তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর।
হে ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী হইতে চাহ নি ভোগী
সত্য-ব্রহ্মে করি সংকোচন,
সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত পান করি চিদমৃত
জিনেছিলে মৃত্যুর শাসন।
উদ্যত-কনকঘট সহস্র দেউল মঠ
কাল দণ্ডে হয়ে গেছে গুঁড়া,
গবল-সিন্ধুর মাঝে তোমার সে শৌর্য রাজে
চিরদিন মৈনাকের চূড়া ॥

বিংশ শতাব্দী

কাজী নজরুল ইসলাম

হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব চেতনায় জাগো, জাগো, ওঠ বীর।
নব ধ্যান নব ধারণায় জাগো
নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো,
সকল কালের উচ্চে তোলো গো শির,
সর্ব্ব-বন্ধ-মুক্ত জাগো হে বীর !

নূতন কণ্ঠে গাহ নূতনের জয়
আমরা ছাড়ায়ে উঠেছি সর্ব্বভয় !
সর্ব্বকালের সব মোহ টুটি
বালারুণ সম উঠিয়াছি ফুটি'
আজিকে সর্ব্ব-পরাধীনতার লয়,
নতুন জগতে আমরা সর্ব্বময় !

আমরা ভেঙেছি রাজার সিংহাসন,
করিয়াছি নরে আমরা গো নারায়ণ।
পায়ের তলার মানুষে টানিয়া
বসায়েছি দেব-বেদীতে আনিয়া,
টুটায়েছি সব দেশের সব বাঁধন
নিখিল-মানব-জাতি এক-দেহ-মন।

পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে,
য়ুরোপ,. রাশিয়া, আরব, মিসর, চীনে,
আমরা আজিকে এক প্রাণ এক দেহ,
এক বাণী—"কারো অধীন রবেনা কেহ !"
চলি একে একে দৈত্য-প্রাসাদ জিনে।
পারি নাই যাহা, পারিব দু'এক দিনে।

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম্ম-আফিম-নেশা,
ধ্বংস করেছি ধর্ম্মযাজকী পেশা!
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মস্‌জিদ,
ভাঙিয়া গির্জ্জা গাহি সঙ্গীত—
এক মানবের একই রক্ত মেশা।
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।

আদিম সৃষ্টি-দিবস হইতে ক্রমে
প্রাচীরের পর প্রাচীর উঠেছে জ'মে।
সে প্রাচীর মোরা ভাঙিয়া চলেছি;
যতই চলেছি ততই দলেছি,
জ্বালায়ে চলেছি পুঞ্জীভূত সে ভ্রমে।
শ্রমণের চেয়ে পূজ্য ভেবেছি শ্রমে।

সংস্কারের জগদ্দল পাষাণ
তুলিয়া বিশ্বে আমরা করেছি ত্রাণ।
সর্ব্ব আচার-বিচার-পঙ্ক হ'তে
তুলিয়া জগতে এনেছি মুক্ত স্রোতে
অচলায়তনের বাতায়ন খুলি'—প্রাণ
এনেছি, গেয়েছি নব-আলোকের গান।

নচিকেতা সম আমরা মৃত্যুপুরী
বারে বারে যাই বারে বারে আসি ঘুরি'।
মৃত্যুরে মোরা মুখোমুখি দেখিয়াছি,
মোদের জীবনে মরণ আছে গো বাঁচি।
স্বর্গ এনেছি মর্ত্তে করিয়া চুরি।
চাহিছে মর্ত্ত দেবতা বাদলে ঝুরি।

সার্থক হ'ল আজিকে ভৃগু সাধন
আমরা করেছি সৃজন নব ভুবন।
এক আদমের মোরা সন্তান,
নাহি দেশ কাল ধর্ম্মাভিমান,
নাহি ব্যবধান, উচ্চ, নীচ, সুজন,
নিখিলের মাঝে আমরা এক জীবন।

আমরা সহিয়া সকল অত্যাচার
অত্যাচারের করিতেছি সংহার।
ধ্বংসের আগে এই পৃথিবীরে
হাসাইতে মোরা আসিয়াছি ফিরে,
শেষের আশীষ আমরা নিয়ন্তার,
খুলিতে এসেছি সকল-বন্ধ দ্বার।

আমরা বাহিনী বিংশ শতাব্দীর
মন্থন-শেষ-অমৃত জলধির
কল্কি দেবের আগে-চলা দূত,
কভু ঝড়, কভু মলয় মারুত,
কভু ভয়, কভু ভরসা লক্ষ্মীশ্রীর।
জীবন মরণ পায়ে বাজে মঞ্জীর !
আমরা বাহিনী বিংশ শতাব্দীর।

সাহেব ও মোসাহেব

কাজী নজরুল ইসলাম

সাহেব কহেন, "চমৎকার ! সে চমৎকার !"
মোসাহেব বলে, "চমৎকার ! সে হ'তেই হবে যে !
হুজুরের মতে অমত কার ?"

সাহেব কহেন, "কী চমৎকার,
বলতেই দাও, আহা হা !"
মোসাহেব বলে, "হুজুরের কথা,
শুনেই বুঝেছি, বাহাহা বাহাহা বাহাহা !"

সাহেব কহেন, "কথাটা কি জান ? সেদিন—"
মোসাহেব বলে, "জানিনা আবার ?
ঐ যে, কি বলে, যেদিন—"
সাহেব কহেন, "সেদিন বিকেলে
বৃষ্টিটা ছিল স্বল্প।"
মোসাহেব বলে, "আহা হা, শুনেছ ?
কিবে অপরূপ গল্প।"

সাহেব কহেন, "আরে ম'লো ! আগে
বলতেই দাও গোড়াটা !"
মোসাহেব বলে, "আহা-হা গোড়াটা !
হুজুরের গোড়া ! এই, চুপ চুপ ছোঁড়াটা !"

সাহেব কহেন, "কি বলছিলাম,
গোলমালে গেল গুলায়ে !"
মোসাহেব বলে, "হুজুরের মাথা !
গুলাতেই হবে ! দিব কি হস্ত বুলায়ে !"

সাহেব কহেন, "শোনো না ! সেদিন
সূর্য্য উঠেছে সকালে !"
মোসাহেব বলে, "সকালে সূর্য্য ?
আমরা কিন্তু দেখিনা কাঁদিলে কোঁকালে !"

সাহেব কহেন, "ভাবিলাম, যাই,
আসি খানিকটা বেড়ায়ে।"
মোসাহেব বলে, "অমন সকাল ! যাবে কোথা বাবা,
হুজুরের চোখ এড়ায়ে।"

সাহেব কহেন, "হ'লনা বেড়ানো,
ঘরেই রহিনু বসিয়া !"
মোসাহেব বলে, "আগেই বলেছি ! হুজুর কি চাষা,
বেড়াবেন হাল চষিয়া ?"

সাহেব কহেন, "বসিয়া বসিয়া
পড়েছি কখন ঝিমায়ে !"
মোসাহেব বলে, "এই চুপ সব !
হুজুর ঝিমান ! পাখা কর, ডাক নিমাইএ !"

সাহেব কহেন, "ঝিমাইনি, কই
এই ত জেগেই রয়েছি !"
মোসাহেব বলে, "হুজুর জেগেই রয়েছেন,
তা আগেই সবারে কয়েছি !"

সাহেব কহেন, "জাগিয়া দেখিনু,
জুটিয়াছে যত হনুমান আর অপদেব !"
"হুজুরের চোখ, যাবে কোথা বাবা ?"
প্রণমিয়া কয় মোসাহেব ॥

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে,
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালবেসে,
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠোনের ঘাসে ;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়াপালে
ডিঙা বায় ; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

গাছ

অমিয় চক্রবর্তী

এই যারে জানি সে তো হাওয়া নয়,
মর্মরে অরণ্যে যার উতলা গভীর পরিচয়।
নয় আলো,
জ্যোতিঃস্পর্শে ছন্দোময় যার মুগ্ধ বন্দনা সাজাচ্ছো
ফাল্গুনী আকাশে
ফুলের উচ্ছ্বাসে।
মাটির গোপন তলে শিকড়ে যে-প্রাণরস বয়
এতো তাও নয়;
এই যে সহজ আজ একান্ত আপন
বনস্পতি পূর্ণতায় হয়েছে মগন।
মর্মে বয় কার সে বারতা,
প্রকাশের কোন শেষ কথা?
মধ্যাহ্নের রিক্তপটে রৌদ্র লেগে
ঐ দেখো বৃক্ষচ্ছবি আছে জেগে।
ধ্যানের মতন
বিশুদ্ধ তাকেই দেখো, যেন।
আলোয় রয়েছে ডুবে, হাওয়া তাকে যায় স্পর্শ ক'রে
মন্ত্র লাগে তারাময় ভোরে
নিগূঢ় সন্ঠারে তাকে মৃত্তিকার দান
করায় প্রাণের রস প্রাণ।
সর্বহান
আছে তবু সর্বমাঝে, চেতনায় হয়েছে সে লীন
অস্তিত্বের গূঢ় যোগে পরম সত্তায়
তাই আজ সবারে সে পায়॥

নিমন্ত্রণ

জসীমউদ্দীন

তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়।
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি,
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভায়ের স্নেহের ছায়,
তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয় ?

ছোট গাঁওখানি—ছোট নদী চলে তারি একপাশ দিয়া,
কাল জল তার মাজিয়াছে কেবা কাকের চক্ষু নিয়া।
ঘাটের কিনারে আছে বাঁধা তরী,
পারের খবর টানাটানি করি
বিনি সুতি মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপার দিয়া,
বাঁকা ফাঁদ পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া।

তুমি যদি যাও আমাদের গাঁয়ে তোমারে সঙ্গে করি,
নদীর ওপারে চলে যাই তবে লইয়া ঘাটের তরী।
মাঠের যতনা রাখাল ডাকিয়া
তব সনে দেই মিতালি করিয়া,
ঢেলা কুড়াইয়া গড়ি ইমারৎ সারা দিন মান ধরি,
সত্যিকারের নগর ভুলিয়া নকল নগর গড়ি।

তুমি যদি যাও—দেখিবে সেখানে মটর লতার সনে,
সীম আর সীম—হাত বাড়াইলে মুঠি ভরে সেই ক্ষণে।
তুমি যদি যাও সে সব কুড়ায়ে
নাড়ার আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে,
খাব আর যত গেঁয়ো চাষীদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে
হাসিয়া হাসিয়া মুঠি মুঠি তাহা বিলাইব দুইজনে।

যাবি, তুই ভাই, যাবি মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়,
ঘন কাল বন—মায়া মমতায় বেঁধেছে বনের বায়।
গাছের ছায়ায় বনের লতায়
মোর শিশুকাল লুকায়েছে হায় !
আজিকে সেসব সরায়ে সরায়ে খুঁজিয়া লইব তায়,
যাবি, তুই ভাই, যাবি মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয় ?

ফ্যান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নগরের পথে-পথে দেখেছ অদ্ভূত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত !
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায়-রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে ব'সে ব'সে ধোঁকে
আর ফ্যান চায়।

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান ;
তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান !
একদিন এরা বুঝি চষেছিলো মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল ;
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,
কোনোদিন নিয়েছিলো কেউ,
জানে নাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়-টলানো।

অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ ;
তার চেয়ে রাখি যদি ফেলে,
প'চে-প'চে আপন বিকারে
এই অন্ন হবে না কি মৃত্যুলোভাতুরা
অগ্নি-জ্বালাময় তীব্র সুরা !
রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?

জয়যাত্রা

আবদুল কাদির

যাত্রা তব শুরু হোক্ হে নবীন, কর হানি দ্বারে,
নবযুগ ডাকিছে তোমারে।

তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায় !
সুপ্তি ত্যজি' বরি' লও তা'রে, লুপ্ত হোক্ অপমান,
দেখা দি'ক্ শাশ্বত কল্যাণ।

সৃজন-উৎসব আজি, হে নবীন, খুলে' দাও দ্বার,
আনো তব নব উপহার।
নিখিল-মানব মিলি' বিশ্ব প্রান্তে পাতিয়াছে মেলা—
উদ্বোধনী-বাণী তা'র তুমি আসো গাহো এই বেলা !

উদার পরাণ মেলি সবাকার লহ আলিঙ্গন,
দৃঢ় হোক আত্মার বন্ধন।

ক্রন্দিছে নিখিল বন্দী, হে নবীন, মুক্ত করো তারে
নিয়ে চলো আলো অভিসারে।

পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল—
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদেরে করো বিচঞ্চল।
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক্‌ সত্যের প্রসাদ
পিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ ॥

অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি', হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন-উল্লাসে।

পাণ্ডুলিপি

বুদ্ধদেব বসু

অজীর্ণ রোগে শীর্ণ, মগজে
পক্ষপাতী পাটিগণিত ঠাশা ;
মাথার অল্প চুল তেলে চিকচিকে,
চোখ দুটো ধূর্ত, লোভে হলদে।
সে তার তেল-চিটচিটে, স্যাঁৎসেঁতে আঙুল দিয়ে
নেড়ে-চেড়ে দেখছে আমার পাণ্ডুলিপির
পাতাগুলো,
যা এর আগে আমি ছাড়া কেউ ছোঁয়নি ;
আর তার ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো গর্ত
আমার দিকে মিটমিট ক'রে বলছে—
'এ-বই আপনার চলবে তো ?'
মনে পড়লো সারা রাত জেগে এই বই যখন শেষ করেছিলুম।
নিজেকে মনে হয়েছিলো দেবতা,
যেন এই শাদা পাতাগুলো দিয়ে ছোট একটি সূর্য আমি তৈরী করেছি,
একটি সূর্য, আমারই প্রাণে জ্বলন্ত।

আর সেই কাক-ভোরে
বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ
ঘুমোতে পারিনি আনন্দে।

যে গাইতে পারে তার গলা বেয়ে যেমন ওঠে গান,
তেমনি আনন্দ উঠছিলো আমার বুক ঠেলে।
ক্লান্ত শরীর, চোখে ঘুমের তৃষ্ণা, তবু আনন্দে
ঘুমোতে পারিনি।

আর তারপর এই ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো মিটমিটে গর্ত
আর লোভে-চিটচিটে দুটো থাবা
আমার পাণ্ডুলিপিটা চটকাচ্ছে।

ভেবেছিলুম একটা মির‍্যাকল ঘটবে, ঘটলো না।
ফেটে পড়লো না আমার ছোটো সূর্য, দারুণ বিস্ফোরণে।
সে তার নোংরা, স্যাঁৎসেঁতে আঙুলগুলো রাখলো আমার লেখার গায়ে—
তবু বেঁচে রইল।

অবাক হ'য়ে গেলুম।

জনম দুখিনীর ঘর

অরুণ মিত্র

দুব্বার কয়েকটা ছোপ
ধানের গুচ্ছের একটু ছটা
কয়েকটা দোয়েল ফিঙে টুনটুনি
নরম হাসির আভা
দু-একজনের ঠোঁট আদর করার মতো খোলা
এই সব নিশানা ধরেই
এখানে ফিরেছি আমি।

দুরন্ত রোদের টিলা পেরিয়ে এলাম,
কুয়াশা প্রান্তর বনবাদাড়ের রাত
আমায় ঘোরায়নি আর,
অচেনা হাটুরে আনাগোনা ক্রমে ক্রমে মুছে গেছে,
নানান্ জিজ্ঞাসাবাদ বিচিত্র ভাষার স্তূপ ঠেলে
এখন আমার কান শুদ্ধ এক ধ্বনিতে পেতেছি।

সেই পিদ্দিমের আলো দেখা যায়,
জনমদুখিনীর ঘর।
কবে আমি বড় হয়ে তাকে ছেড়ে চ'লে আসি
তবু তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে,
ঘুমের সময় যত গল্প ছিল আমাদের
অন্ধকার ভরাত যা সবই সে তো রূপকথার,
তবু দুঃখ ঘোচানোর গোপনতা নিয়ে
গল্পের রাতের মধ্যে অভিভূত আমরা ঘুমোতাম।

তারপর একদিন বেরিয়েছি,
সন্ধ্যার সীমান্তজোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে
কতদূর চ'লে গেছি,
বিভুঁই মনের মধ্যে পথ খুঁজে কতবার দিশেহারা,
রূপকথার কোনো দেশ দেখিনি তো।
আজ দুব্বা ধান পাখি দেখে
ভালোবাসার দু-একটা মুখ দেখে
এখানে ফিরেছি।

পিদ্দিম জ্বলার একলা ঘর,
ওই আলো অন্ধকার আমার নাড়িতে বাজে,
আমার শ্রবণ একক স্বরের স্থিতি পায় :
ভাঙাচোরা বুড়ি গলা
বিশুদ্ধ অতলস্পর্শ,
ঘরে ফিরতে বলে ডাকে।
সলতেটা নেভার পরও এই ডাক ঘুরতে থাকবে
যতক্ষণ না আমি
রাত্তিরের গল্পগুলো মনে চেপে
আবার দাঁড়াব গিয়ে দুঃখের দুয়োরে।

ভাষা

বিষ্ণু দে

ভয় নেই, মনে রেখো আশা,
মমতায় ব্যাপ্ত করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে তন্দ্ শালবন,
তিতিরের ডাক শোনো ঘুঘুর কূজন
হাঁসের ঝাপট আর ময়ূরের নাচ,
এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা।

এখনই কি ভয় ? রেখো আশা,
প্রাত্যহিকে মগ্ন করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে চলেছে বুনন,
খামারে খামারে ধান, বাগানে গুঞ্জন,
পরবের দিনে রাতে মাঠে ঘরে নাচ
এখানেই ভিৎ গড়ে ভাষা।

ভয় কেন, কবি ? আছে আশা,
সততায় স্থির করো মন,
স্থির-লক্ষ্য চলেছে পিস্টন,
লেদের আবর্তে গড়ো নানা আয়োজন
ক্রেনের বাহুতে দেখ বিশ্বব্যাপী নাচ,
সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু ভাষা ছাড়ো মন,

অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালী-ধনুকের টানে টানে ঝনন্-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে-নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা।

খুকুর শান্তি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

গঙ্গার কূলে সাদা কাশফুলে সোনালী রোদের
আলো-ঝলমল-সকালে,
প্রজাপতি ওড়ে, রেশমি-নরম-আলপনা আঁকা
রঙিন পাখায়
কে যেন এঁকেছে শান্তির ছবি !
ভাবে খুকুমণি, কি যেন সে ভাবে ! খুশি-খুশি মুখ,
অবাক ডাগর দু'টি চোখ তার,
চুপচাপ চেয়ে থাকে ।

বুকে ভালবাসা-জাগানো শরৎ
সকালে সোনার, রোদের সেতার বাজায় !
পান্না-সবুজ ঘাসে ঘাসে জ্বলে
রাতে-ঝরা মনি-মুক্তো শিশির-কণারা ।
প্রজাপতি গান গায়, সে-গানের
শুনতে না-পাওয়া সুরটা কেমন ?
কেউ কি শুনেছ ?
প্রজাপতিটার ফুরফুরে পাখা থরথর কাঁপে বাতাসে ।

মাটির কোলের কাছটিতে আহা, প্রজাপতি ওড়ে !
ছায়া-ঝিলমিল
মায়া সিঁড়ি ভেঙে, কাশের ডগায়,
রুপালী কেশর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওঠে নামে !
হালকা নাচের পাল্লায় তার ঘাসফুলে বসে একটি ফড়িং
নাচায় অভ্রপাখা ।
খুকু ভাবে কেন ভোম হয়ে কালো ভোমরাটা থাকে
গোলাপের রাঙা পাপড়িতে বসে একা ?

হলদে-বেগুনী-সোনালী-সবুজ-খয়েরী-গোলাপী
লাল-নীল নানা রঙের ধাঁধায় কেঁপে কেঁপে ওঠে প্রজাপতিটার
রঙিন পাখার আহা কী বাহার !

বসেছে ক্লান্ত, সোনারোদ মাখা
একটি পাতায় শান্ত নিথর,
কিন্তু ঐ যে-ওটা কী ওখানে ?
ডালটায় বসে ?   উঃ কী ভীষণ চেহারা !

রাক্ষুসে মুখ গিরগিটি বুঝি ?
চীনা-পুরাণের ড্রাগণের মতো লকলকে জিভ নড়ে,
ওত্ পেতে আছে, প্রজাপতিটাকে
এখুনি ধরে টপ্ কোরে গিলে খাবে।
সোনালী রোদের আলো নিভে যাবে,
ফুল ঝরে যাবে প্রজাপতিদের কান্নায়।
খুকু বলে, 'ওরে বোকা প্রজাপতি, উড়ে যা, উড়ে যা,
পালারে এখুনি শিগ্গির উড়ে পালা'।

হামাগুড়ি দিয়ে ডাল বেয়ে বেয়ে
হিংসুটে ক্রুর বিশ্রী বিকট ভোঁতা মুখখানা
ঐ যে যাচ্ছে ক্ষুদে রাক্ষস,
শান্ত নিরীহ প্রজাপতিটাকে ঐ বুঝি ধরে ফেলে !
খুকু ছুটে যায়,—ডাল নাড়া দেয়,
সাড়া পেয়ে পাখা কাঁপিয়ে আকাশে
উড়ে যায় প্রজাপতি।
গিরগিটিটার সে কী রাগ !   ডালে আছড়ায় লেজ
মুখ ভেংচায় !
আহ্লাদে খুকু হাততালি দিয়ে নাচে।

———

ইতিহাস

অশোকবিজয় রাহা

হঠাৎ কল্লোল শুনি ইতিহাস থেকে
ছুটে আসে প্রকাণ্ড জোয়ার—
উদ্বেলিত জীবনের ঢেউ
চারদিক হতে
ছুটে আসে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতন
অজস্র উচ্ছ্বাসে।

বিস্ময়ে তাকাই
মুহূর্তেই চেয়ে দেখি একভিড় মানুষের মুখ
নেমে আসে পাহাড় ডিঙায়ে—
ছুটে যায় মাঠ বেয়ে—আকাশে ছিটায়ে
রাশি-রাশি কলহাসি,—
ছুটে যায় সমুদ্রের তীরে,
অজস্র হাসির ফেনা ঢেলে যায় সমুদ্রের জলে।

কাস্তে

দিনেশ দাস

বেয়নেট হোক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!
শেল আর বম হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু।

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে !

ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
কাল যারা করেছিলো পূর্ণ,
কামানে-কামানে ঠোকাঠুকিতে
আজ তারা চূর্ণবিচূর্ণ ঃ

চূর্ণ এ-লোহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
গ'লে পরিণত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে !

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই ! চেয়ে দ্যাখো বন্ধু !
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ মাটির কাস্তেটা, বন্ধু !

চিঠি

মনীন্দ্র রায়

সুশান্ত, তোমার মনে পড়ে
সরলার মাকে, যে এখানে
কাজ করত ? হঠাৎ সেদিন
শুনল যেই বন্যা পাকিস্তানে,
বুড়ি গিয়ে বসল বারান্দায়,
দেখি তার চোখে জল ঝরে।

জানতাম অবশ্য পাবনায়
বাড়ি তার, উদ্বাস্তু রমণী।
কিন্তু নেই তিন কুলে কেউ,
সরলাও গেছে পরলোকে,
তার মনে জাগল কার শোকে
দ্বিতীয় বন্যার এই ঢেউ ?

তোমাকে, সুশান্ত, সত্যি বলি
এ ঘটনা কিছু গুরুতর
তা ভাবিনি, তবু কৌতূহলী
প্রশ্ন করি—কাঁদো কেন ? বানে
পাবনাতেই শুধু বাড়িঘর
ডোবেনি তো ! তাছাড়া ওখানে

কী আছে তোমার, কেন কাঁদো ?
শুনে বুড়ি চোখ মুছে বলে—
কান্নায় তখনো বাধোবাধো
গলা তার—বলল, কাঁদি কেন
তা তোমারে বোঝাই কী করে ?
ভগবান আমারে দিল যে

কাঁদনের কপাল কী কব !
সোয়ামী মরেছে কোন কালে,
এক মেয়ে সেও গেল শেষে।
ভিটামাটি ছেড়ে একা আমি
বেঁচে আছি এ পোড়াকপালে
তোমাদের দুয়ারে বিদেশে !

আমি হেসে সান্ত্বনার সুরে
বলি, মিছে বিদেশ কেন যে
ভাবো তুমি, এই তো তোমার
আপনার দেশ। এখানেও
বন্যা কত দেশ গ্রাম মোছে,
কতো ঘরে মৃত্যু হাহাকার।

বুড়ি বলে, আহা বাছা তারা
বেঁচে থাক। আমি অতশত
বুঝি না তো। কিন্তু সেই বাড়ি
এতোটুকু হ'তে যারে চিনি
আর সেই ঘর পুবদুয়ারী
সিঁদুরে আমের সেই চারা

সবই আজ পরের অধীনে,
তবু সবই ছিল—পর কেন
তারাও তো আপন আমার—
নগদ দামেই নিল কিনে
রহিমের বাবা, এতোদিনে
বানে ডুবল সে ঘরদুয়ার।

বলি আমি—গেছে যেতে দাও
জলজ্যান্ত আমরা তো আছি,
আমাদেরই দেখে শান্তি পাও।
বুড়ি বলে—ও সোনা, ও সোনা,
বেঁচে থাকো এ মাথায় চুল
যতো আছে! তবু তো রসুল

করিমের বেটা তারো কথা
কিছুতেই ভুলতে পারি না যে!
এ দুর্দিনে সে কি বেঁচে আছে,
আছে মাঝিপাড়ার আমিনা,
আর সেই বুড়া বটগাছ
তারো কথা ভুলতে যে পারি না।

সরলার মা তো নিরক্ষরা।
মনে তার দুজ্ঞেয় জগৎ।
যে বিশ্বাসে পাখি বাসা গড়ে,
গাছে ফুল ফোটে, ধরে ফল,
মা তার শিশুকে বুকে তোলে
যুক্তি তর্ক সেখানে অচল।

কাজেই নীরবে উঠে আসি।
দেখি, বুড়ি ঘোলা চোখে চেয়ে
ভাবে তার হারানো জীবন,
কতো স্বপ্ন ছবির মতন
ভেসে ওঠে সে দৃষ্টিতে, আর
তোলপাড় করে তার মন!

বুঝি সে তো খোঁজে না স্বদেশ
টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে,
ঘর-বাড়ি-মানুষ-প্রকৃতি
বিন্দু বিন্দু মিলে যে উন্মেষ
সে দীপ্ত আলোতে তার স্মৃতি
আশ্বিনের প্রখর আকাশ!

সুশান্ত, দেশকে ভালোবাসো
এ তোমার গর্ব—আমারো তা!
কিন্তু এই শিরায় শিরায়
ওতঃপ্রোত আশ্চর্য চেতনা
আছে কি? বল তো কার মনে
সোনা হ'য়ে জ্বলে ধূলিকণা!

স্বাগত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধান বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।
সূর্য পাটে বসেছে কখন।
রাখালের দেখা নেই—
কোথাও গরুর পাল ওড়ায় না ধুলো ;
ঢেঁকিতে ওঠে না পাড়,
একটি কলসীও জল ওঠায় না ঘাটে।
বুনো ঘাসে পথ ঢাকে,
বিনা শাঁখে সন্ধ্যা হয়,
সূর্য বসে পাটে।
তাঁতি বোনে না কো তাঁত,
কলু আর ঘোরায় না ঘানি ;
কুমোরের ঘরে চাবি,
ঝাঁপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানি,
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে
ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর।
যে পথে কামার গেছে
কে জানে সে পথের খবর ?
শীতের আমেজ আসে ;
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমণ্ডপের কোলে।
হাতে হাতে ঘোরে নাকো হুঁকো
চুলোচুলি হয় নাকো মোড়লে মোড়লে।
নিশুতি রাত্রিতে কারো
চৌকি শুনে কুকুর ডাকে না,
দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে,
মাঠের সোনালি ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।

দুচোখে প্রতীক্ষা তার,
স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে।
ডাক ওঠে শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে ঃ
মাঠের ফসল দিন গোণে।
প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে ;
নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।

জননী যন্ত্রণা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একুল-ওকুল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা-হা-হা-হা
পাহাড় থমকে পাথর, নদীয় পা-টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্ছা বোন ঃ ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর বা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মতো এককোণে বউ, দুয়োরে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।
　　এক-যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে-ছেলে মা
　　ঘর যে তোমার ঘরে-ঘরে, জননী যন্ত্রণা ॥

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল দু'কূল মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও-কার নৌকো, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায় ?
সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কেউ ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ-বা কলে-কারখানায়।
একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে ঃ
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখে মেলে ঃ
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা ॥

জন্মভূমি আজ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয় নি ;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিশ্বাস নিতে পারছো না।
মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।
তুমি যে ভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাও নি।

মাটিতো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।
যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা করছে ;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

উলঙ্গ রাজা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে ঃ শাবাশ, শাবাশ !
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয় ;
কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে ;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক ;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।

গল্পটা সবাই জানে।
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশস্তিবাক্য-উচ্চারক কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু ;
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

শিশুটি কোথায় গেল ? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে ?
নাকি সে পাথর-ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায় ?
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক :
রাজা, তোর কাপড় কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে,
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

বাঙ্‌লা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রাহমান

বাঙ্‌লা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাঙ্‌লা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্য শিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুম কলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাঙ্‌লা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি ; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কোন্ সে সুদূরে ; সত্তা তার
আশাবরী। নানী বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে
দুলে রমজানী সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরী—অলৌকিক ভোর।

প্রবচন

(১) অহিনকুল সম্পর্ক
(২) অণ্টরম্ভা
(৩) আক্কেল-সেলামী
(৪) আকাশ থেকে পড়া
(৫) আঠারো মাসে বছর
(৬) আষাঢ়ে গল্প
(৭) আঁতে ঘা
(৮) ইঁচড়ে পাকা
(৯) উত্তম-মধ্যম
(১০) উভয়-সঙ্কট
(১১) একাই একশ
(১২) ওজন বুঝে চলা
(১৩) মামাবাড়ির আবদার
(১৪) কড়ায়-গণ্ডায়
(১৫) কেউকেটা
(১৬) কেঁচেগণ্ডূষ
(১৭) গদাইলস্করী চাল
(১৮) ঘোড়ার ডিম
(১৯) চাঁদের হাট
(২০) চোখে গোখে রাখা
(২১) চুনোপুঁটি
(২২) ছেলের হাতের মোয়া
(২৩) জগা-খিচুড়ি
(২৪) জলের আলপনা
(২৫) টইটুম্বুর
(২৬) টনক নড়া
(২৭) ঠুঁটো জগন্নাথ
(২৮) ঠোঁট-কাটা
(২৯) ডুমুরের ফুল
(৩০) ঢাকের বাঁয়া
(৩১) তাসের ঘর
(৩২) তীর্থের কাক
(৩৩) দু'মুখো সাপ
(৩৪) দু'নৌকায় পা
(৩৫) চক্ষুশূল
(৩৬) পাকা ধানে মই
(৩৭) চোখে সর্ষে ফুল দেখা
(৩৮) বালির বাঁধ
(৩৯) বুকের পাটা
(৪০) মান্ধাতার আমল
(৪১) বাপের বেটা
(৪২) গোড়ায় গলদ
(৪৩) মাটির মানুষ
(৪৪) মিছরিব ছুরি
(৪৫) রাঘব বোয়াল
(৪৬) মুখের কথা
(৪৭) রফা নিষ্পত্তি
(৪৮) নয়নের মণি
(৪৯) হ-য-ব-র-ল
(৫০) হাতের পাঁচ

মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা

নং .... মু/সহায়ক পাঠ/ ১৯৯৪